ভারতের সংবিধান

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

ভারতের সংবিধান

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম বাংলা সংস্করণ : মার্চ্চ, ১৯৬৯

স্বীকৃতি :

'সাক্ষরতা নিকেতন', লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ কর্তৃক সর্বপ্রথম হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত। বর্তমান পুস্তকটি মূল হিন্দী হইতে অনুবাদাকারে প্রকাশ করিবার অনুমতি ও আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন 'সাক্ষরতা নিকেতন' লক্ষ্ণৌ-৫।

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ,
১৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
হইতে সত্যেন মৈত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

আই. এন. এ. প্রেস,
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : দুই টাকা

নিবেদন

সমাজ-শিক্ষার গোড়ার কথা হল নিজেদের পরিবেশকে জানা ও বোঝা, নিজেদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও সমাজের কল্যাণার্থে সেই জ্ঞান ও চেতনা সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বিকৃত। সহজ ও সরল ভাষায়, যা স্বল্প ও নবশিক্ষিতদের বোধগম্য হতে পারে, এই বর্তমান বইটি সে ভাবে লেখা হয়েছে। গত বৎসর আমরা সাক্ষরতা নিকেতনের সহায়তায় 'আমরাই সরকার' বইটি বার করি। তাতে পঞ্চায়েৎ ও জাতীয় সরকার সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান দেবার চেষ্টা করা হয়। 'ভারতের সংবিধানের' আরো বিশদ অথচ সহজভাবে সেই আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্ণৌর সাক্ষরতা নিকেতনের 'ভারতকা বিধান' বইটির এটা ভাবানুবাদ। আশাকরি যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা হয়েছে তা সফল হবে।

সত্যেন মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক, বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

ভারতের সংবিধান

২৮শে জুন, ১৯৫২ সালের কথা। কলকাতার পুলিশ সাব ইনস্পেকটর সন্তোষকুমার দত্তের কাছে এক চিঠি এল। চিঠি লিখেছেন পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার। সেই চিঠিতে লেখা: তাঁর চাকুরী খতম হয়েছে। বেচারি দত্ত মহা মুশকিলে পড়লেন। তিনি কি করবেন? তিনি আদালতে হাজির হলেন। মামালায় জজ রায় দিলেন: যে অফিসার চাকুরী দেন, তাঁর নীচের কোন অফিসার সে-চাকুরী খতম করতে পারেন না। এই হল সংবিধানের বিধান। সন্তোষকুমার দত্তকে পুলিশ কমিশনার চাকুরী দিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর নীচে ডেপুটি কমিশনারের সে-চাকুরী খতম করার হক নেই। এই রকম একটি বিধান ভারতের সংবিধানে আছে বলে দত্ত বেঁচে গেলেন।

আরেক ঘটনা। ১৩ই জুন ১৯৫০ সালে মধ্য প্রদেশের সাগর বলে এক জায়াগায় ডেপুটি কমিশনার কয়েকটি

গ্রামের উপর এক হুকুম জারী করলেন ঃ খেতের কাজের মরশুম শুরু হয়ে গেছে, সে-জন্যে এখন আর কেউ বিড়ি তৈরীর কাজে বহাল থাকতে পারবেন না। সব লোককে এখন খেতের কাজে জুটতে হবে—যাতে ফসল উৎপাদনের আর চাষবাসের কোন ক্ষতি না হয়। এই হুকুম জারির ফলে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে জোর অসন্তোষ দেখা দিল। দুজন বিড়ি শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। তাঁরা বললেন, সংবিধান দেশের সকল মানুষকে স্বাধীনভাবে মনোমত কাজ করার অধিকার দিয়েছে। এই জন্যে তাঁদের বিড়ি তৈরীর ব্যবসায়ে বাধা দেওয়া সংবিধান বিরোধী।

সরকার আপনাকে বাঁচাতে চেয়ে এক দলিল পেশ করলেন। তাতে বলা হল, বিধানে এও লেখা আছে—জনসাধারণের ভালর জন্য সরকার দরকার হলে কাজ কারবারের ওপর কিছু বিধিনিষেধ করতে পারেন।

জজ তাঁর রায়ে লিখলেন,—সংবিধান অনুসারে দুতরফের কথাই ঠিক। কিন্তু এই বিধিনিষেধ উচিতমত হওয়া চাই। সরকার নির্দয় হয়ে লোকজনের মনোমত ব্যবসায় বাধা দিতে পারেন না।

এখানে সরকার যে হুকুম জারী করেছেন তা যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি। বিড়ি তৈরীর কাজ পুরো বন্ধ করার দরকার নেই। অবশ্য, বিড়ি তৈরী যাঁদের পেশা, তাঁদের সামনে কিছু কড়া শর্ত রাখা যেতে পারে। সেগুলি তাঁদের মানতে বাধ্য করা যেতে পারে। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার অনুচিত বাধা দিয়েছেন মানুষের স্বাধীন ব্যবসায়ে। তাই তাঁর হুকুম সংবিধান বিরোধী। জজ সরকারের বিরুদ্ধেই মত দেন।

এই দুটি কাহিনীই সত্য ঘটনা। এ থেকে বোঝা যায় যে সংবিধানের বিপরীত কাজ সরকারও খুশিমত করতে পারেন না। সংবিধান এমনই এক জিনিস যে— সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—তাকেও তার কথা মানতে হয়। সংবিধান আমাদের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। আমাদের নানা রকমের সুযোগ স্বাধীনতা, অধিকার আর সুবিধা দিয়ে রেখেছে।

সংবিধান কি?

তা হলে জানতে হয় সংবিধান কি জিনিস। কি করেই বা তা এল। তার ক্ষমতা কতখানি।

আজ থেকে বাইশ বছর আগে ইংরেজ আমাদের দেশে রাজত্ব করত। আমরা তাদের সঙ্গে লড়ি। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা কি কায়দা কানুন অনুসারে চলবে তাই স্থির করার জন্যে আমরা সংবিধান তৈরী করেছি। আমরা অন্য দেশের সংবিধান থেকে ভাল-ভাল কায়দা-কানুন আমাদের সংবিধানে নিয়েছি। এইভাবে অন্য দেশের সংবিধানের ভাল জিনিসগুলি আমাদের সংবিধানে নেওয়া হয়েছে। এই সংবিধান—বা দেশ শাসনের কায়দা-কানুন—দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সংবিধান।

আমাদের সংবিধান ভাল করে বুঝতে হলে প্রথমে নীচে লেখা কথাগুলি ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার ঃ

১। ভারত সরকার বলতে কি বোঝায়?—

ভারতের সরকারের অর্থ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে জনসাধারণের রাজ চালানো। এই ধরনের রাজকে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলা হয়।

২। ভারতে দু ধরনের সরকার আছে ঃ

(ক) রাজ্য-সরকার

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার

ভারতে ১৬টি রাজ্য আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাজ্য সরকার থাকে যারা আপন রাজ্যকে শাসন করে। যেমন উত্তর প্রদেশের রাজ্য-সরকার উত্তর প্রদেশ শাসন করে। বিহার রাজ্য-সরকার বিহারে শাসন করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকার পশ্চিমবঙ্গে শাসন করে। কোন রাজ্য-সরকারের সব প্রধান দপ্তরগুলি যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গা সেই রাজ্যের রাজধানী। যেমন—উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখ্‌নৌ, বিহারের রাজধানী পাটনা, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা, রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর ইত্যাদি। রাজ্য-সরকারের সবচেয়ে উঁচু পদে রয়েছেন রাজ্যপাল।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সারা দেশের উপর। এই সরকারের সকল প্রধান দপ্তর দিল্লীতে। দিল্লী ভারতের

রাজধানী। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারের ক্ষমতা কমাতে অথবা বদলাতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে উঁচু পদে যিনি রয়েছেন, তাঁকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি।

প্রতি রাজ্যে একটি বিধান-মণ্ডলী থাকে, যা রাজ্যের আইন তৈরী করে। বিধান-মণ্ডলীর দুইটি সভা—বিধান-সভা আর বিধান-পরিষদ। বিধান-সভার সদস্যদের জনসাধারণ পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত করেন। বিধান-পরিষদে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য, বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পাওয়া লোক, অধ্যাপক আর রাজ্যপালের মনোনীত লোকেরা থাকেন। কিছু রাজ্যের বিধান-মণ্ডলীতে শুধু বিধান-সভাই আছে।

৪। সংসদ সারা দেশের আইন তৈরী করেন। এতেও দুটি সভা আছে—লোকসভা আর রাজ্যসভা। লোকসভার সদস্যদের জনসাধারণ পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত করেন। রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির বিধান-সভার দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা থাকেন। রাষ্ট্রপতিও কিছু সদস্যকে মনোনীত করেন।

৫। ভারতের কিছু এমন প্রদেশ আছে যার শাসনের

কাজ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার চালান। এগুলিকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বলা হয়।

৬। এই সংবিধানে যে-সব কায়দা-কানুন লেখা আছে তা রাষ্ট্রপতির মত নিয়ে লোক-সভা আর রাজ্য-সভার মিলিত বৈঠকে বদলানোও যেতে পারে।

ভারতের সংবিধানের প্রধান বিষয়গুলি এর পর বলা হচ্ছে।

নির্বাচিত করেন
রাষ্ট্রপতি
নির্বাচিত করেন
রাজ্যসভার জন্য সদস্য
সংসদ
লোকসভা সদস্যদের
রাজ্য বিধানসভাপতির
সদস্যদের
নির্বাচিত করেন
ভোটদাতা
নির্বাচিত করেন
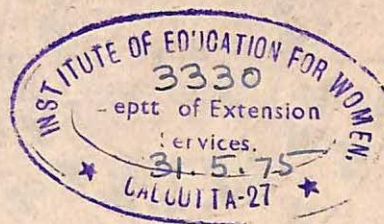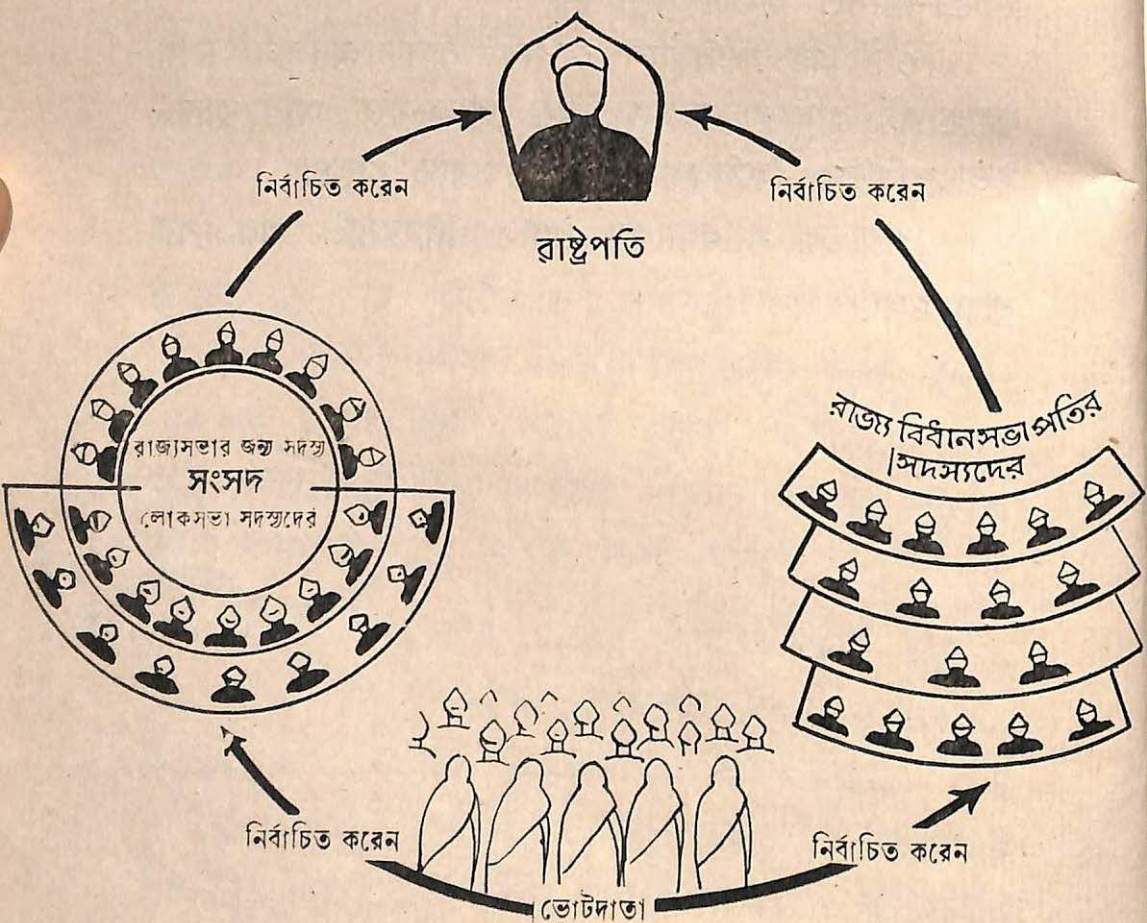
কেন্দ্রীয় সরকার

রাষ্ট্রপতি

দেশের সবচেয়ে বড় পদের অধিকারীকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়। সারা দেশের শাসনের ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকে। সবচেয়ে বেশি অধিকার তাঁর। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। কিন্তু দেশের সব মানুষ সরাসরিভাবে তাঁকে নির্বাচিত করেন না। তাঁর নির্বাচন সংসদ আর বিধানসভাগুলির সদস্যরা করেন। তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সেই ব্যক্তি হতে পারেন :

১। যাঁর ৩৫ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে।

২। যিনি কোন সরকারী কর্মে নিযুক্ত নন (রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল আর মন্ত্রীদের সরকারী কর্মচারী বলা হয় না।)

৩। যাঁর লোকসভায় নির্বাচিত হবার যোগ্যতা

আছে (কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা যেতে পারে তার বিষয় পরে দেখুন)।

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের আগেও উপরাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্ব ত্যাগ করে আপন পদে ইস্তফা দিতে পারেন। এক ব্যক্তি একাধিক বারের জন্যও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। তিনি বিনা ভাড়ায় বাড়ি পান। এই বাড়ির নাম রাষ্ট্রপতি ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবন দিল্লীতে। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি আপন খরচের জন্য বছরে পনের হাজার টাকা আর তাঁর দপ্তরের খরচ বাবদ চার হাজার টাকা পান।

রাষ্ট্রপতির অধিকার

রাষ্ট্রপতিকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধান। দেশের সবচেয়ে বড় অধিকর্তা তিনি। এত অধিকার থাকলেও আসলে তাঁর নামে দেশ চালান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। সব কাজের দায় তাঁদেরই। তাঁদেরই পরামর্শে রাষ্ট্রপতি হুকুম-নামায় সই করেন।

রাষ্ট্রপতিকে দেশের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় নায়ক বলে গণ্য করা হয়। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। পরে তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। তিনি সবচেয়ে বড় আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) আর হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। রাজ্যপালকে তিনিই নিযুক্ত করেন। তিনি অন্য দেশে ভারতের রাজদূত নিয়োগ করেন। অন্যান্য অধিকর্তাদেরও নিয়োগ করেন তিনি।

অপরাধীর সাজার মেয়াদ কমানো বা মাফ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। ফাঁসির হুকুমও তিনি রদ করতে পারেন। অন্য দেশের কাছে তিনি আপন দেশের অর্থাৎ ভারতের প্রতিনিধি বলে গণ্য হন। আর সংসদের মত নিয়ে তিনি অন্যদেশের সঙ্গে সন্ধি করতে পারেন।

সংসদে কোনো বিল পাস হবার পর রাষ্ট্রপতির কাছে তা অনুমোদন পাবার জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ না করতে পারলে সে বিল আইনে পরিণত হতে পারে না।

যে-অবধি না রাষ্ট্রপতির সুপারিশ মেলে, সে অবধি নূতন কোনো রাজ্য গঠনের বা দুইটি রাজ্যের সীমানা

অদল বদল করার কোনো বিল সংসদে পেশ করা যায় না। রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতেও কিছু বিষয় আছে যাতে তাঁর অনুমোদন পাওয়া জরুরী। দেশের আভ্যন্তরীন অর্থাৎ ভিতরের ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন কোনো বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে পেশ হতে পারে না। বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর কর আর সর্বজনীন কাজে দরকারী জনসাধারণের জমি দখল করার জন্যে রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে পাশ হওয়া বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত আইনে পরিণত হতে পারে না।

যখন সংসদের দুই সভা বা এক সভার কোন বৈঠক চলছে না, তখন দরকার হলে রাষ্ট্রপতি এমন কয়েকটি ঘোষণা জারী করতে পারেন যেগুলি আসলে আইন নয় (কারণ সংসদে তা পাশ হয়নি)। কিন্তু এগুলিকে আইনের মতই গণ্য করা যেতে পারে। এই বিশেষ আইনগুলিকে অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ বলা হয়। এগুলি বরাবরের জন্য অবশ্য চালু থাকে না। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার ছ' সপ্তাহের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়। দরকার হলে সংসদ এই অধ্যাদেশকে পাশ করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে তা আইনে পরিণত করতে পারেন। তখন সেই

আইন জারী করা যায়। রাষ্ট্রপতি সংসদের দুটি সদন বা একটি সদনের অধিবেশন ডাকতে পারেন। আবার তিনি অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারেন।

যখন দেশে কোনো সংকট দেখা দেয়, সেই সময় রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তিনটি কারণে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায়ঃ

১। যখন দেশের নিরাপত্তা দেশের ভিতরে গোলমাল বা বাইরের হামলা আসায় বিপন্ন হয়ে ওঠে—যেমন চীন বা পাকিস্তানী হামলায় ভারতের বিপদ ঘনিয়ে উঠেছিল।

২। যখন কোন রাজ্যে বা কতকগুলি রাজ্যে সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী কাজকর্ম না হয়।

৩। যখন দেশের আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে যায়, অর্থাৎ যেমন ধরা যাক, টাকার দাম হঠাৎ একেবারে পড়ে গেল বা টাকার দরুণ অভাব ঘটল।

যখন দেশের নিরাপত্তা বাইরে থেকে হামলা আসায় বা ভিতরে গণ্ডগোল ঘটায় বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাজ্য-সরকারগুলির সকল অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেন। এইরকম অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-

সরকারগুলির শাসন ব্যাপারে হুকুম দেন যাতে সংবিধান মোতাবেক কাজকর্ম চলতে থাকে। এই ঘোষণা দুমাস অবধি চালু থাকতে পারে। সংসদ চাইলে এই ঘোষণাকে আরও কিছু সময় চালু রাখতে পারেন। এই রকম অবস্থায় নাগরিকদের পাওয়া কিছু কিছু অধিকার কেড়ে নেওয়া সম্ভব আর তার বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ করা যায় না। চীন আর পাকিস্তানী হামলায় এমনি জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছিল।

যখন রাজ্য-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ না মানেন তখন রাষ্ট্রপতি ধরে নেন যে সেখানকার প্রশাসন সংবিধান অনুযায়ী হচ্ছে না। তখন তিনি সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এই অবস্থায় রাজ্য বিধানসভার সমস্ত আইন তৈরীর অধিকার সংসদের হাতে চলে আসে। কিন্তু এমত অবস্থাতেও রাজ্যের হাইকোর্টের কাজ কর্মে কোন বাধা পড়ে না। এই অবস্থাতে নাগরিকদের কিছু সুযোগ সুবিধার ছাঁটকাট করা হয়। এই ঘোষণা দু মাস কাল অবধি চালু থাকে। কিন্তু যদি সংসদের অনুমোদন মেলে তো অধিক পক্ষে তিন বছর অবধি তা চালু থাকতে পারে।

যদি দেশের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে, তা হলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি কাটতে পারেন। দেশের সকল আদালতের জজদের মাইনেও কাটা যেতে পারে। এই ঘোষণা দুমাস অবধি বহাল থাকতে পারে আর সংসদের মত পেলে আরও কিছু দিন চালু রাখা যেতে পারে।

যতদিন রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্বে বহাল থাকেন, তিনি যা কিছু কাজই করুন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ আনা যায় না। যতদিন তিনি রাষ্ট্রপতি থাকেন তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা রুজু করা করা যায় না।

যদি রাষ্ট্রপতি সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন তা হলে সংসদের দুই সভা মিলে তাঁকে তাঁর পদ থেকে হটিয়ে দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

লোকসভার যে দলের সবচেয়ে বেশি সদস্য নির্বাচিত হন, সেই দলই সরকার গঠন করেন। সেই দলের

রাষ্ট্রপতি
নিযুক্ত করেন
প্রধান মন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর
পরামর্শ অনুসারে
মন্ত্রী মণ্ডলী
লোকসভা
রাজ্যসভা

নেতাকে প্রধান মন্ত্রী বলা হয়। তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। তারপর রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মাফিক তাঁর দল থেকে কয়েকজনকে কাজকর্ম চালাবার জন্যে নিযুক্ত করেন। এঁদের মন্ত্রী বলা হয়। সব ক'জন মন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গড়ে ওঠে। এঁদের পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রপতি দেশের সরকার চালান। মন্ত্রীদের সকলকেই লোকসভা বা রাজ্য-সভার সদস্য হতে হয়।

সব মন্ত্রীরাই একে অপরের কাজের জন্যে দায়ী হন। মন্ত্রিসভাতে একবার যে নীতি ঠিক করা হয় তার বিরুদ্ধে কোন মন্ত্রী প্রকাশ্যে কোন কিছু বলতে পারেন না। যদি মন্ত্রিসভার নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকে,—তা হলে আগে তাঁকে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিতে হবে। তার পরেই তাঁর মত তিনি বলতে পারেন।

যাঁরা প্রধান মন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রী হন তাঁদের সংসদের কোনো সভার সদস্য হতেই হবে। যদি তিনি না হয়ে থাকেন তাহলে প্রধান মন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী হবার ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে সংসদের যে কোনো একটি সভায় নির্বাচিত হওয়া অবশ্যই দরকার। মন্ত্রীরা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অবধি আপন আপন পদে বহাল থাকতে

পারেন। কিন্তু যদি লোকসভার অধিকাংশ সদস্য কোনো মন্ত্রীর ওপর আর বিশ্বাস না রাখতে পারেন, তাহলে তাঁকে আপন পদ ছেড়ে দিতে হয়।

দেশ-শাসনের কাজগুলি মন্ত্রীদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়। এর ফলে শাসন-কার্যের অনেক সুবিধা হয়। মন্ত্রীসভা যে সব বিষয় স্থির করেন, প্রধান মন্ত্রী সে সবই রাষ্ট্রপতিকে জানান।

উপ-রাষ্ট্রপতি

উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন লোকসভা আর রাজ্যসভার সদস্যরা মিলে করেন। এই সদস্যরাই আবার তাঁকে সেই পদ থেকে দরকার হলে হটিয়েও দিতে পারেন। যে ব্যক্তির বয়স ৩৫ বছর পুরো হয়েছে, যিনি ভারতের নাগরিক, তিনিই উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

আগেই বলেছি, সংসদের দুটি সভার একটির নাম রাজ্য-সভা। উপ-রাষ্ট্রপতি এই সভার সভাপতি হন। অসুখ-বিসুখের দরুন, মৃত্যু বা অন্য কারণে যখন

রাষ্ট্রপতির জায়গা খালি হয়, তখন উপ-রাষ্ট্রপতি সেই জায়গায় কাজ করেন যতদিন না অন্য রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয়।

সংসদ

সংসদে দুটি সভাগৃহ আছে—লোকসভা আর রাজ্য-সভা। এই দুই সভার সদস্যরা মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের জন্য আইন তৈরী করেন।

লোকসভা

লোকসভার সদস্যদের দেশের জনসাধারণ সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেন। এই সব নির্বাচিত ব্যক্তিদের জনতার প্রতিনিধি বলা হয়। দেশের সকল রাজ্যের লোকেরা আপন আপন এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে লোকসভায় পাঠান। এছাড়াও লোকসভায় দু'জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে বেশিপক্ষে ২০ জন প্রতিনিধি থাকতে পারেন। আজকাল লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫১৮।

বিধান সভাগুলির দ্বারা
নির্বাচিত ২৩৮ জন সদস্য
রাজ্যসভা
সংসদ
লোকসভা
রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত ১২ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি
রাজ্য বিধান মণ্ডলী সমূহ
জনতা
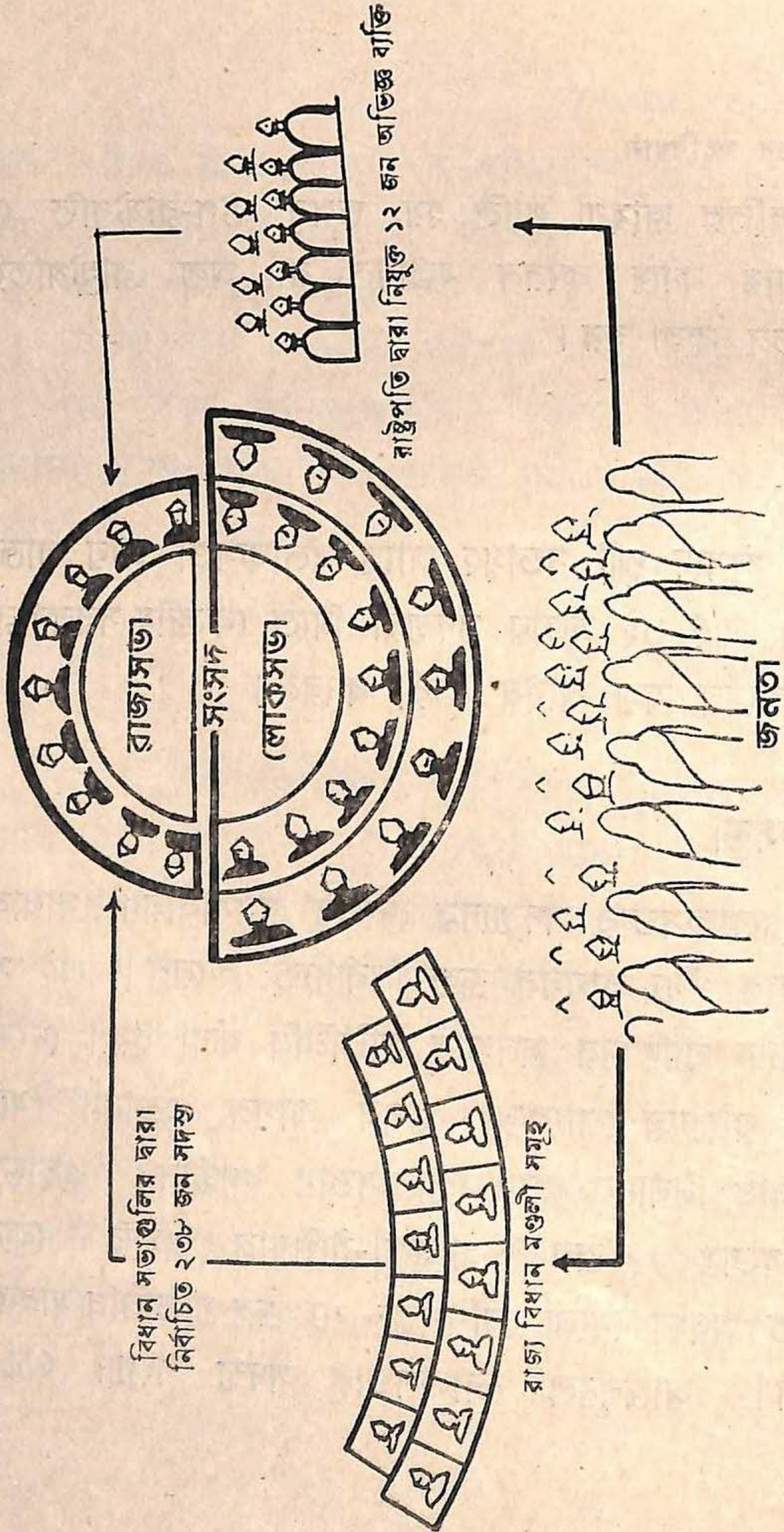
লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য যে কোন ধর্ম বা জাতির লোক দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু তাঁকে এই শর্তগুলি পূরণ করতে হবে ঃ

১। তাঁর বয়স ২৫ বছরের কম হলে চলবে না।

২। তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে।

৩। তিনি পাগল বা দেউলিয়া হবেন না।

৪। তিনি কোনো সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকবেন না। কোনো ব্যক্তি সংসদের উভয় গৃহের একসাথে সদস্য হতে পারবেন না। আবার তিনি সংসদ আর বিধানমণ্ডলীতে, এই দুই জায়গায় একই সঙ্গে সদস্য থাকতে পারবেন না। যদি কোনো সদস্য ৬0 দিন অবধি সংসদের কাজকর্ম চলাকালে বিনা নোটিসে হাজির না থাকেন তা হলে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি আর সংসদের সদস্য নন।

সদস্যদের পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি চান তা হলে পাঁচ বছরের আগেই লোকসভা বাতিল করে দিতে পারেন আর নতুন সাধারণ নির্বাচন করাতে পারেন।

লোকসভার সদস্যদের মধ্যে থেকেই অধ্যক্ষ আর উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়। অধ্যক্ষ লোকসভার কাজ

কর্মের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। লোকসভার বৈঠককে বলা হয় লোকসভার অধিবেশন। সেই অধিবেশনে কোন সদস্য কেমন প্রশ্ন তুলছেন, সেই প্রশ্ন উচিত কি উচিত নয়—এসব বিষয় অধ্যক্ষ বিবেচনা করেন। অধ্যক্ষ হাজির না থাকলে উপাধ্যক্ষ এই সব কাজ করে থাকেন।

রাজ্য-সভা

যদি রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করেন তা হলে লোকসভার আয়ু পাঁচ বছরের জায়গায় ছ' বছর অবধি বাড়ানো যেতে পারে। বিপদ কেটে যাওয়ার পর লোকসভার কাল আরও ছ' মাসের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

রাজ্য-সভার সদস্যদের সারসরি জনতার ভোটে নির্বাচন করা হয় না। রাজ্য-সভার সদস্য যাঁরা হতে চান, তাঁদের বয়স ৩০ বছরের কম হলে চলবে না। বয়সের শর্ত ছাড়াও অন্য যে শর্তগুলি লোকসভার প্রার্থীদের সম্পর্কে বলা হয়, এঁদের বেলাও সেগুলি থাটে।

এই সদনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ২৫০-এর

বেশি হবে না। এই সংখ্যার ভিতর ১২ জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। যাঁরা সমাজের সেবায়, বিজ্ঞান, কলা, এইসব কাজে কর্মে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি, তাঁদের তিনি মনোনীত করেন। অন্য সদস্যরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় এলাকার প্রতিনিধি হন। রাজ্যের প্রতিনিধিদের বিধান সভার সদস্যরা নির্বাচন করেন। কেন্দ্রীয় এলাকার প্রতিনিধিদের নির্বাচন সংসদ যেসব নিয়ম, সময় স্থির করেন, সেই নিয়ম অনুসারে করা হয়ে থাকে।

এখন রাজ্য-সভার সদস্য সংখ্যা ২৩৬। রাজ্য-সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দু' বছর অন্তর অবসর নেন। এই কারণে প্রতি দু' বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে নির্বাচন করা হয়। এই জন্যে আমরা দেখি রাজ্য-সভা কোন সময়ই খতম হয় না—যদিও পাঁচ বছর অন্তর লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতি যখন দরকার মনে করেন, তখন দুটি সভারই বৈঠক ডাকতে পারেন। রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন, কিন্তু রাজ্য-সভা ভাঙতে পারেন না।

সংসদের দুটি সভাতেই সকল সদস্যদের বলবার পুরো অধিকার আছে। কোন সদস্য এই দুই গৃহের মধ্যে

দাঁড়িয়ে যাই বলুন না কেন তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলে না। সংসদের সদস্যরা মাসিক বেতন পান। এ ছাড়া কোন সদস্য যতদিন বৈঠকে হাজির থেকে অংশ নেন, ততদিনের ভাতাও তিনি পেয়ে থাকেন।

সংসদের কাজকর্ম

সংসদের কাজ দেশের আইন-কানুন তৈরী করা। সংসদ আরও দেখেন যে সরকারের কাজ ঠিক সংবিধানের মতে হচ্ছে কি হচ্ছে না। সংসদের উভয় সভার বৈঠকে যে কোন সদস্য সরকারের কাজকর্ম বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। সেই প্রশ্নের জবাবদিহির দায় যে মন্ত্রীর তাঁকেই তার উত্তর করতে হবে। এইভাবে শাসন-কার্যের জন্য যে খরচ খরচা হয়, তার মঞ্জুরী সংসদই দিয়ে থাকেন। সংসদের হুকুম বিনা সরকার কোনো নতুন ট্যাক্স বসিয়ে আয় বাড়াতে পারেন না। এমন কিছু কাজ কর্ম আছে যার বিষয়ে সংসদই একমাত্র আইন বানাতে পারেন। আর এমন কিছু কাজকর্ম আছে, যার বিষয়ে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন তৈরী করতে পারেন।

যে বিষয়গুলিতে সংসদ আইন তৈরী করতে পারেন তা হল: দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রের ব্যাপার, নাগরিকতা, রেলপথ, জাহাজ, বিমান, ডাকঘর, টাঁকশাল, দেশের আভ্যন্তরীন, অর্থাৎ ভিতরের ব্যাপার, ব্যাংক, শ্রমিক কল্যাণ, দেশের নদনদী, মাছের বিষয়, জনগণনা বা আদমসুমারি, কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরী, সর্বোচ্চ আদালত, ইত্যাদি।

যে বিষয়গুলির উপর সংসদ আর রাজ্যের বিধানমণ্ডলী উভয়েই কানুন তৈরী করতে পারেন, তা হল: দেওয়ানি আর ফৌজদারি আইন, বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদ, বুড়ো লোকদের পেনসন, কারখানা, বিদ্যুৎ, খবরের কাগজ, ছাপাখানা, ভবঘুরেদের আটক রাখার জায়গা, ইত্যাদি।

যদি কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার কোন একটি বিষয়ে আলাদা আলাদা আইন বানিয়ে থাকেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনটিই মানা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কোন আইন রদ করেও দিতে পারেন।

আইন তৈরীর কায়দা

যে বিষয়ের উপর আইন তৈরী করা হয়, তা প্রথমে একটি বিল আকারে সভায় পেশ করা হয়। এই বিল যে কোনো সদস্যই পেশ করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিলটি সংসদের উভয় সভায় পাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি তা রাষ্ট্রপতির কাছে মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো যায় না। যখন রাষ্ট্রপতি সেই বিল মঞ্জুর করেন তখনই তাকে একটি "আইন" বলা হয়। যখন কোন বিল কোন সভায় পেশ করা হয়, তা তিন বার পড়া হয়ে থাকে। প্রথম দফায়, যিনি বিল পেশ করেছেন, তিনি বিলের মর্ম পড়ে শোনান। দ্বিতীয় দফা পড়ায় সময়ে বিলের প্রত্যেকটি ধারা ব্যাখ্যা করে বলা হয়। আর যেখানে দরকার মনে হয় সেখানে কিছু সংশোধন করা যেতে পারে। যখন কোন অদল-বদল বা সংশোধন করা বাকি থাকে না তখন তৃতীয় দফা পড়া হয়। এর পর সেই বিলের ওপর ভোট নেওয়া হয়। যদি বিলের পক্ষে বেশি ভোট থাকে তা হলে তা পাশ বলে ধরা হয়। যদি তা না হয় তা হলে বিলটি বাতিল হয়। এর পর অন্য

সদনে ঐ পাশ হওয়া বিল সেখানে পাশ হওয়ার জন্য পাঠানো হয়। সেখানেও ঐ বিল একই কায়দায় তিনবার পড়া হয়ে থাকে।

বিল দু ধরনের হয়ে থাকে ঃ

১। অর্থ বিল ২। সাধারণ বিল।

অর্থ বিল

সরকারের সমস্ত টাকাকড়ি আর সম্পদ যে ভাণ্ডারে জমা করা হয় তাকে সঞ্চিত ভাণ্ডার বলে। অর্থ বিল বলতে বোঝায়, যা,

১। এই ভাণ্ডার থেকে খরচ বা জমা করার উদ্দেশে রচনা করা হয়।

২। কোন নতুন ট্যাক্স বসানো বা কোনো ট্যাক্স কমানোর বিষয়ে রচনা করা হয়।

৩। কোনো রকম ঋণ গ্রহণের উদ্দেশে রচনা করা হয়। অর্থের বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই পেশ করা হয়ে থাকে। যে অবধি রাষ্ট্রপতির সুপারিশ না মেলে সে অবধি তা পেশ করা যায় না।

লোকসভায় মঞ্জুর হওয়ার পর বিল রাজ্যসভায় পাঠানো হয়ে থাকে। রাজ্য-সভা যে মতামত দেন তা যদি লোকসভা মেনে নেন তাহলে বিল উভয় সভায় পাশ হয়েছে বলে ধরা হয়। রাজ্য-সভা যদি এমন কোনো মতামত দেন যা লোকসভা পছন্দ করেন না, বা রাজ্য-সভা চোদ্দ দিনের মধ্যে কোনো রায় না দেন, তা হলেও বিল দুটি সভাতেই পাশ হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। এরপর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হয়। এই বিল রাষ্ট্রপতিকে মঞ্জুর করতে হয়।

এইভাবে আমরা দেখি যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের খেয়ালমত টাকা খরচ করতে পারেন না। প্রত্যেকটি খরচের জন্য তাঁদের সংসদ আর জনতার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

সাধারণ বিল

অর্থ বিল যে যে কাজের জন্যে রচনা করা হয় তা ছাড়া অন্য সব কাজের ব্যাপার সাধারণ বিলের আওতায় আসে। সাধারণ বিলের জন্যে দুই সদনেরই

মঞ্জুরী দরকার হয়। এরপর তা রাষ্ট্রপতির কাছে মঞ্জুর করানোর জন্যে পাঠানো হয়।

সাধারণ বিল সংসদে আনবার জন্যে আগেভাগে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ দরকার হয় না। এই বিল লোকসভা বা রাজ্য-সভায় পেশ করা যায়। যে সভায় তা পেশ করা হয়, সেখানে তা মঞ্জুর হলে অন্য সভাতে আবার মঞ্জুরীর জন্যে পাঠানো হয়। যদি তা যেমনটি পাঠানো হয় সেই একইরূপে অন্য সভাতে পাশ হয়ে যায়, তা হলে তা দুই সভাতেই পাশ হয়েছে মনে করা হবে। আর রাষ্ট্রপতির কাছে তখন মঞ্জুরীর জন্যে পাঠানো হবে।

আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য সভার সদস্যরা সেই বিলকে কিছুটা পালটে দিলেন। অর্থাৎ সংশোধন করলেন। তখন সেই সংশোধন সমেত তা ফিরে আসে যেখানে বিলটি প্রথম দফায় পাশ করা হয়েছিল, সেই সভাতে। সেখানে সংশোধনটি মঞ্জুর করানোর জন্যে বলা হয়। যদি এই সভা সংশোধন মঞ্জুর করেন তা হলে বিল উভয় সভাতেই পাশ বলে ধরা হয়। তখন বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে।

আর যদি এই সভা অপর সভার সংশোধন মানতে রাজি না হন, তথন রাষ্ট্রপতি দুই সভার একটা যুক্ত বৈঠক ডাকেন। যে আকারে এরপর বিলটি এই বৈঠকে বেশি ভোটে পাশ হয়, সেই আকারেই বিলটি দুই সভাতে পাশ হয়েছে বলে ধরা হয়। এমনি যুক্ত বৈঠক ডাকার আরও প্রয়োজন হয়, যথন প্রথম সভাতে মঞ্জুর করা বিল অপর সভাতে না-মঞ্জুর করা হয়।

সংসদে মঞ্জুর হওয়া বিল তথনই আইনে পরিণত হয় যথন রাষ্ট্রপতি তা মঞ্জুর করেন। রাষ্ট্রপতি যথন তা না করেন, তথন সংশোধন সমেত তা সংসদে ফেরৎ দেওয়া হয়। উভয় সদন তথন রাষ্ট্রপতির যুক্তিগুলি বিচার করেন। রাষ্ট্রপতির মতামত তাঁদের মানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিচার বিবেচনার পর বিলটি যথন ফের রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়, তথন রাষ্ট্রপতিকে তার উপর মঞ্জুরী দিতেই হয়।

রাজ্য সরকার

আমাদের দেশকে ১৭টি রাজ্য আর ৯টি কেন্দ্রীয় এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। রাজ্যগুলি হল ঃ—১। আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, ৩। ওড়িষ্যা, ৪। উত্তর প্রদেশ, ৫। কেরল, ৬। গুজরাত, ৭। জম্মু-কাশ্মীর, ৮। পঞ্জাব, ৯। পশ্চিম-বঙ্গ, ১0। বিহার, ১১। মাদ্রাজ, ১২। মধ্য প্রদেশ, ১৩। মহারাষ্ট্র, ১৪। মহীশূর, ১৫। রাজস্থান, ১৬। হরিয়ানা ১৭। নাগাভূমি।

কেন্দ্রীয় এলাকাগুলি সরাসরি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে। এই এলাকাগুলি হল ঃ

১। আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ২। গোয়া, দমন আর দিউ, ৩। দাদরা আর নগর হাভেলী, ৪। দিল্লী, ৫। পণ্ডিচেরী, ৬। মণিপুর, ৭। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় আর আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ, ৮। হিমাচল প্রদেশ আর ৯। ত্রিপুরা। এ ছাড়া আসাম রাজ্যের একটি এলাকা

নেফা—যার দেখাশোনার বিষয় ভারত সরকারের পরামর্শে হয়ে থাকে।

প্রতি রাজ্যে আলাদা-আলাদা রাজ্য-সরকার হয়। সকল রাজ্যের শাসন-প্রণালী মোটামুটি একই ধরণের হয়।

রাজ্যপাল

যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তা হলেন রাষ্ট্রপতি, তেমনি রাজ্য-সরকারের উপরে রয়েছেন রাজ্য-পাল। রাজ্যপালের নামেই সারা রাজ্যের কাজ চলে। রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্যে নিযুক্ত করেন।

রাজ্যপাল হতে পারেন তিনিই, যাঁর ঃ

১। বয়স ৩৫ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে।

২। যিনি ভারতের নাগরিক।

৩। যিনি কোন চাকুরী বা কারবারে বহাল নন।

রাজ্যপাল প্রতি মাসে ৫,৫00 টাকা বেতন পান। তাঁর বাসের জন্যে বিনা ভাড়ায় একটি বাড়ি দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যপাল যে বাড়িতে থাকেন, তার নাম হল রাজভবন।

রাজপাল হাইকোর্টের বিচারপতিদের পরামর্শ নিয়ে ছোট আদালতগুলির বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য আর অধ্যক্ষকেও নিযুক্ত করেন।

তিনি রাজ্যের বিধান পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে মনোনীত করেন। তিনি রাজ্যের বিধান-মণ্ডলীর দুটি সদনের (বিধান-সভা আর বিধান পরিষদ) অধিবেশন ডাকেন। তিনি আবার বৈঠক চলা-কালে তা বন্ধ করেও দিতে পারেন। তিনি বিধানসভা বাতিল করেও দিতে পারেন। যদি বিধান-মণ্ডলীর দুটি সদনের কোনটিরই অধিবেশন না চলে, তখন প্রয়োজন হলে রাজ্যপাল কিছু আইন তৈরী করতে পারেন। তা আবার বিধান-মণ্ডলীর বৈঠক শুরু হওয়ার ৬ সপ্তাহ পরে নাকচ হয়ে যায়। রাজ্যের বিধান-মণ্ডলীতে পাশ হওয়া কোন বিল, রাজ্যপালের মঞ্জুরী না-পাওয়া পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় না। রাজ্যপাল নিজে মঞ্জুর করতে পারেন, নয়ত রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর মতামত দেবার জন্যে পাঠাতে পারেন। রাজ্যপাল মঞ্জুরী দেবার আগে, সাধারণ বিলের ওপর তাঁর মন্তব্য লিখে তা আবার বিধান-মণ্ডলীতে

ফেরৎ পাঠাতে পারেন। সেই মন্তব্য মেনে নিয়ে, বা না-মেনে যদি বিধান-মণ্ডলী দ্বিতীয় বার বিলটি মঞ্জুর করে দেন, তখন রাজ্যপালকে তা মঞ্জুর করতেই হয়। যদি বিধান-মণ্ডলীতে এমন কোন বিল পাশ হয় যার প্রভাব রাজ্যের উচ্চ আদালত বা হাইকোর্টের ওপর খারাপ ভাবে পড়ে, তা হলে রাজ্যপাল সেই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর মন্তব্যের জন্য পাঠাতে পারেন।

রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থ-বিল বিধান-মণ্ডলীতে পেশ করা যায় না। বিধান-মণ্ডলীর খরচ করার জন্যে টাকাকড়ির দাবী রাজ্যপালের সুপারিশেই করা যায়। অপরাধী ব্যক্তির সাজা রাজ্যপাল কম করতে বা মকুব করতে পারেন।

এ-সব অধিকার রাজ্যপাল প্রয়োগ করেন রাজ্য-মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী। রাষ্ট্রপতির মত তিনিও সাংবিধানিক প্রধান নামেই।

রাজ্যপাল যে অবধি কাজে বহাল থাকেন সে অবধি তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ করা যায় না। যতদিন তিনি রাজ্যপাল থাকেন ততদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মকদ্দমা করা যায় না। দুমাসের

নোটিস দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কেবল তেমন অভিযোগের ওপরই দেওয়ানী মামলা চালানো যেতে পারে যার দায়িত্ব তাঁর নিজের।
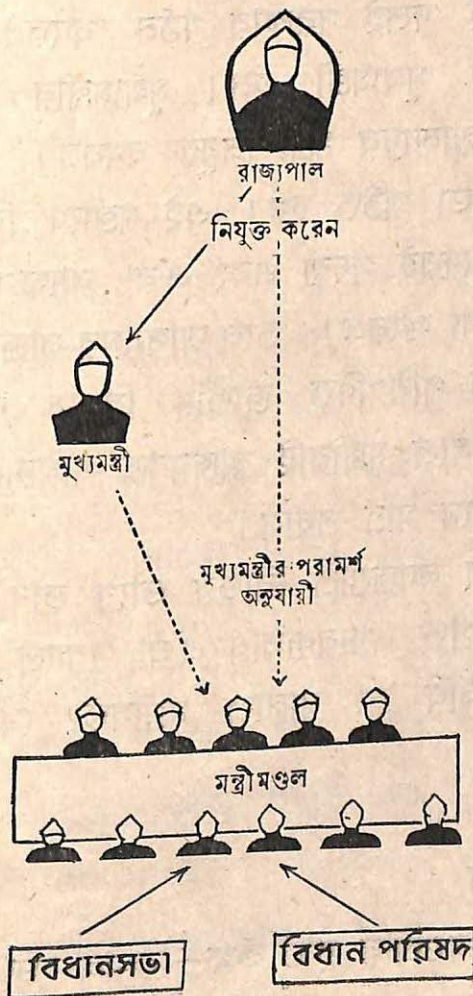
মন্ত্রীসভা

বিধান সভার বেশীর ভাগ সদস্য যে দল থেকে জেতেন সেই দলই সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মত রাজ্যপাল অন্যান্যদের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই মন্ত্রীদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীরা বিধানসভা ও বিধান পরিষদেরই সদস্য এবং এঁরা রাজ্যপালকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করেন। তবে আসামের রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়া পরিগণিত জাতীয় বিষয়ে কাজ করতে পারেন। আসলে মন্ত্রীরাই রাজকাজ পরিচালনা করেন, রাজ্যপাল নামে মাত্র প্রধান।

মন্ত্রীদের কাজগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। মন্ত্রীসভায় গৃহীত আচরণবিধি এঁরা সকলে মেনে চলেন। এই আচরণবিধি না মানলে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

বিধান-মণ্ডলী

বিধান-মণ্ডলীর দু'টি কক্ষ—বিধান-সভা আর বিধান-পরিষদ। এক সাথে কেউ দুই কক্ষের সদস্য হতে পারেন না।

আজকাল প্রত্যেক সদস্য ২৫০ টাকা বেতন পান এবং যেদিন বৈঠক বসে সেদিনের ভাতাও তিনি পেয়ে থাকেন।

বিধান-সভা

যাঁরা ভারতের নাগরিক ও ২৫ বছর বয়স হয়েছে তাঁরাই সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হন। বিধান-সভার নির্বাচন পাঁচ বছর অন্তর হয়। রাজ্যপাল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধে পাঁচ বছরের পূর্বেই বিধান সভা ভাঙতে পারেন। রাজ্য বিধান-সভায় কম করে ৬০ জন সদস্য থাকেন। তবে কোন রাজ্য বিধান-সভায় ৫০০ জনের বেশী সদস্য থাকতে পারেন না। আজকাল পঃ বঙ্গের বিধান সভায় ২৮০ সদস্য ও ৪ জন মনোনীত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য আছেন।

বিধান-সভার সদস্যদের মধ্যে থেকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের মতো বিধান-সভাতেও অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ একই কাজ করেন।

বিধান-পরিষদ

বিধান-পরিষদের সদস্য হতে হলে কম করে ৩০ বছর বয়স ও ভারতের নাগরিক হতে হবে।

একটি রাজ্যে বিধান-পরিষদের যে ক'জন সদস্য হন তার এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ও জিলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা (গ্র্যাজুয়েটরা) মোট সদস্যের ১/১২ ভাগ নির্বাচিত করেন।

১/১২ শতাংশ সদস্য নির্বাচিত করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য বিধান-সভার সদস্যরা নির্বাচিত করেন, তবে এই নির্বাচিত সদস্যরা বিধান-সভার সদস্য হলে চলবে না। অবশিষ্ট সদস্যরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিরা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। দু' বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ বিধান-পরিষদের সদস্য অবসর গ্রহন করেন এবং খালি জায়গার জন্য পুনরায় নির্বাচন হয়।

বিধান-মণ্ডলীর দুই কক্ষেরই সদস্যরা স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং সেজন্য অথবা ভোটদানের জন্য তাঁদের উপর মামলা চলে না। জম্মু ও কাশ্মীর
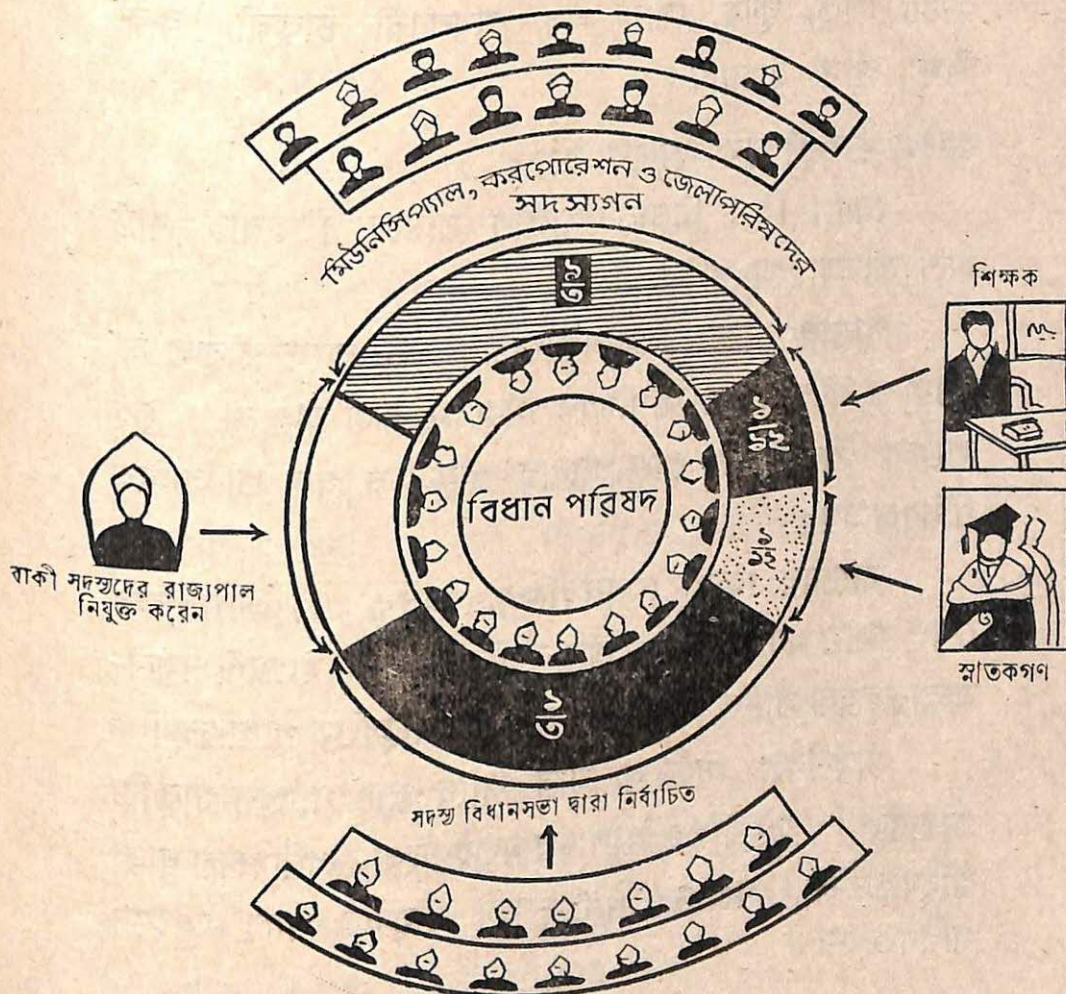
ছাড়া বিধান-মণ্ডলী নিজ নিজ রাজ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইন তৈরী করতে পারেন ঃ

রাজ্যের ব্যবসা, জেল, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, রাস্তা, সেতু, কৃষি, সেচ, বন, সরকারী চাকুরী, কর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

আইন তৈরী কি ভাবে হয়

কোন বিল বিধান-মণ্ডলীর সামনে তিনবার পাঠ হলে তা আইনে পরিণত হয়।

সাধারণ বিল বিধান-মণ্ডলীর দুটি কক্ষে স্বীকৃত না হওয়া অবধি তা রাজ্যপালের স্বীকৃতির জন্য যায় না। দুই কক্ষের স্বীকৃতি ও রাজ্যপালের স্বীকৃতির পর তা আইনে পরিণত হয়।

রাজ্যের কোন কোন বিল, যেমন ঃ (১) বিদ্যুৎ কর (২) সবার কাজে লাগে এমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি দখল-করার জন্য রচিত আইনে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতির প্রয়োজন।

অর্থ-বিল পেশ করবার আগে রাজ্যপালের স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই বিল সংসদের মতই বিধান-পরিষদের দ্বারা স্বীকৃতি না পেলেও বিধান-সভা স্বীকৃতি দিলে আইনে পরিণত হয়।

আদালত

সর্বোচ্চ আদালত

ভারতের সবচেয়ে বড় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত। এটি দিল্লীতে অবস্থিত।

রাষ্ট্রপতি ভারতের বিশিষ্ট বিচারপতিদের পরামর্শমত সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ আদালত ও অন্যান্য উচ্চ আদালতের বিশেষ বিশেষ বিচারপতিদের পরামর্শমত সর্বোচ্চ আদালতের অন্য ১৪ জন বিচারপতি নিয়োগ করেন। বিচারপতিরা ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

সংসদ সদস্যরা যাতে নিজেদের খুশিমত এঁদের পদচ্যুত করাতে না পারেন সেজন্য এঁদের পদচ্যুত করবার বিষয়ে কিছুটা সাবধানতা রাখা হয়েছে।

যখন বিচারপতিগণ নিজ চাকুরী বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন তখন তাঁরা নির্ভয়ে ঠিক রায় দিতে এমন কি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিতে ভয় পান না।

যাঁরা উচ্চ আদালতে ১0 বছর ওকালতি অথবা ৫ বছর বিচারপতির কাজ করেন কেবলমাত্র তাঁরাই সর্বোচ্চ আদালতের জজ হতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি ৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ মাসে ৪ হাজার টাকা করে বেতন পান।

এই আদালতে দুভাবে মামলার শুনানী হয়ঃ (১) এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের বিরোধ। (২) যদি কোন রাজ্যের উচ্চ আদালত কোন মামলার রায় দানকালে সাংবিধানিক অসুবিধা বোধ করেন, তখন সেই মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদনের শুনানী হয়।

দেওয়ানী ২0 হাজার টাকার অধিক সম্পত্তির মামলার আপীল এই আদালতে করা যেতে পারে।

যদি এমন কোন মামলা যার উচ্চ আদালত ও ছোট আদালত একই রায় দান করেছেন, কিন্তু কোন সাংবিধানিক বিষয়ের ব্যাখার দরকার হয় তা হ'লে সর্বপ্রকার প্রমাণ পত্রনিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা যেতে পারে।

সুপ্রিম
কোর্ট
রাষ্ট্রপতি
নিযুক্ত করেন
সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের
বিশিষ্ট জজেদের
পরামর্শ অনুসারে
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান
এবং হাইকোর্টের বিশিষ্ট
বিচারপতিদের পরামর্শ অনুসারে
অন্যান্য ১৪ জন বিচারপতি
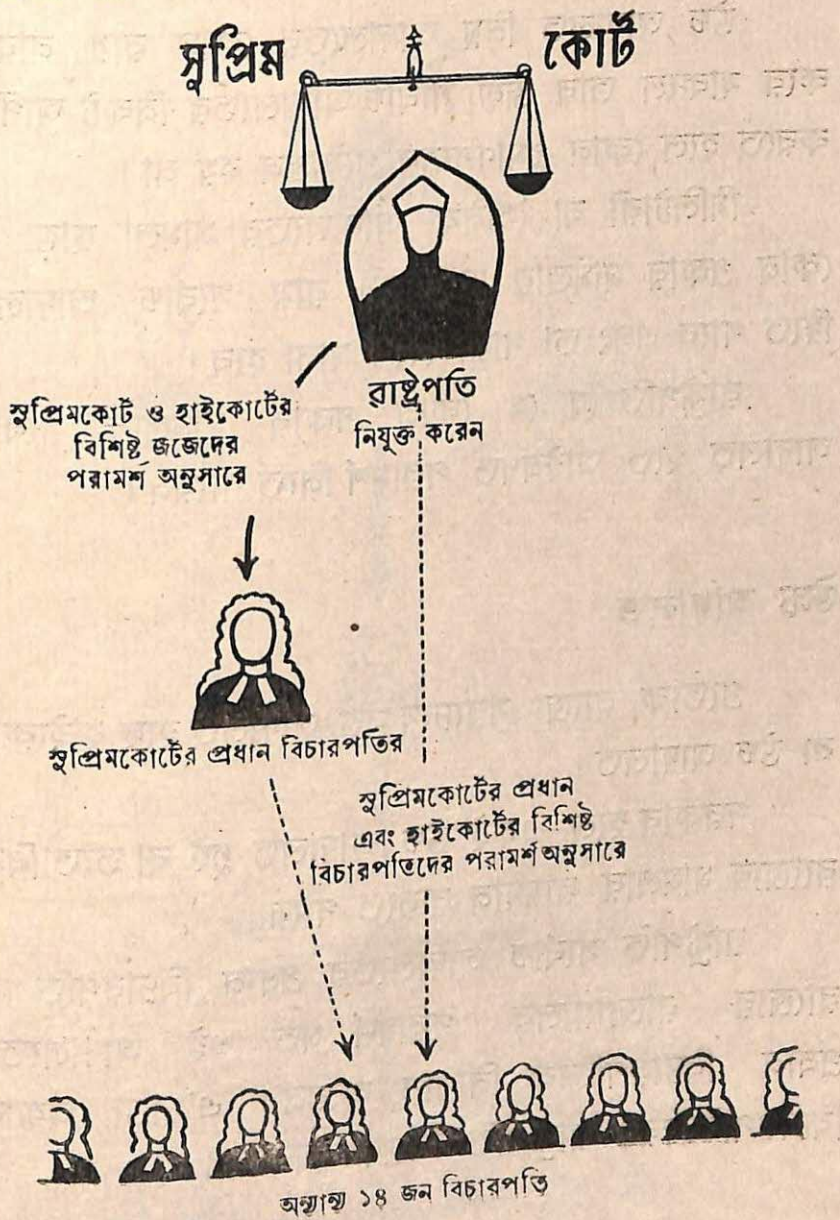
উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের কোন রায় নাকচ করে থাকলে তার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের নিকট আপীল করতে হলে কোন প্রমাণপত্রের প্রয়োজন হয় না।

মিলিটারী বা সৈনিক আদালতের মামলা ছাড়া যে কোন প্রকার মামলার আপীলের রায় সর্বোচ্চ আদালত দিতে পারে এবং তা সারা দেশে মানা হবে।

রাষ্ট্রপতি যে যে কোন প্রকার মামলার সর্বোচ্চ আদালত হতে আইনগত পরামর্শ নিতে পারেন।

উচ্চ আদালত

প্রত্যেক রাজ্যে সবচেয়ে বড় আদালত হচ্ছে হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত।

দরকার হলে একই উচ্চ আদালত দুই বা ততোধিক রজ্যের মামলার রায়দান করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যের রাজ্যপালের পরামর্শ মত এই আদালতের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। এ'ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদেরও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

হাই কোর্ট
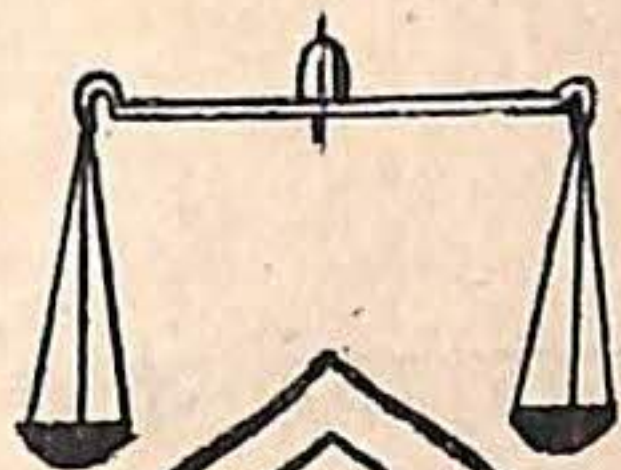
রাষ্ট্রপতি

এই দুজনের পরামর্শমত
রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন

রাজ্যপাল

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

রাষ্ট্রপতি, হাইকোর্টের অন্যান্য
বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন
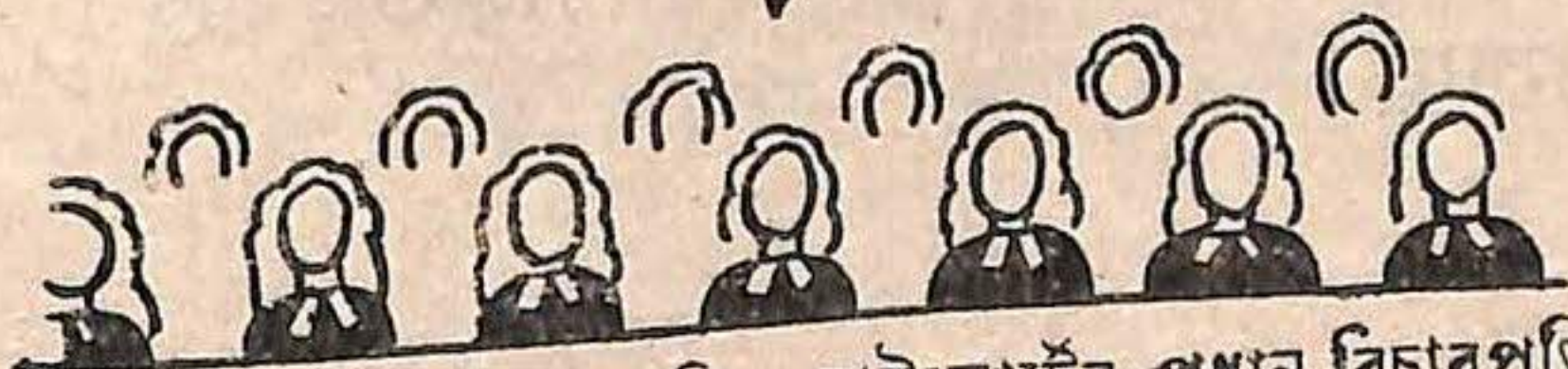
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও
অন্যান্য বিশিষ্ট জজদের এবং রাজ্যপালের পরামর্শ মত

যিনি উচ্চ আদালতে কম করে ১০ বছর ওকালতি করেছেন তিনিই এই আদালতে বিচারপতি হবার যোগ্য।

এই আদালতে প্রধান বিচারপতি ৪ হাজার টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিরা ৩ হাজার ৫ শত টাকা করে মাসিক বেতন পান।

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রকার বিরোধীতা করলে তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যেতে পারে।

উদাহরণ, আমরা ঘোরা-ফেরার অবাধ অধিকার পেয়েছি। এখন যদি পুলিশ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির না করে ২৪ ঘণ্টার বেশী কাউকে আটক রাখে, তাহলে আমরা উচ্চ আদালতে পুলিশের সেই কাজের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারি।

যদি ছোট আদালতে ঠিকমত বিচার না হয় তো উচ্চ আদালতে সেই মামলার শুনানী হতে পারে।

সৈনিক আদালত ছাড়া অন্য সব ছোট, নিম্ন আদালতের সকল কাজে উচ্চ আদালত নজর রাখে ও দেখাশুনা করে।

উচ্চ আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী হয়।

নিম্ন আদালত

প্রতি জেলায় তিন প্রকার আদালত আছে—ফৌজদারী, দেওয়ানী ও রাজস্ব।

ফৌজদারী আদালত

এই প্রকার আদালতে চুরি, ডাকাতি, খুন, বিশ্বাস-ঘাতকতা, আঘাত করা, জালিয়াতি ইত্যাদি মামলার শুনানী হয়ে থাকে।

এই আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী সেসন জজের আদালতে হয়।

প্রতি জেলায় একজন সেসন জজ ও কিছু সহায়ক সেসন জজ থাকেন।

দেওয়ানী আদালত

এই আদালতে দেনা-পাওনা, জমি-জমা, সম্পত্তি বিষয়ের মামলার রায় দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ

সব-জজ, মুন্সেফ, সিভিল জজ ও জেলা জজ এই সব মামলার রায় দান করে থাকেন।

সব-জজ আদালতে দেউলিয়া ও ১ হাজার টাকার নীচের মামলা শুনানী হয়।

মুন্সেফ আদালতে ১ হাজার টাকার অধিক অথচ ৫ হাজার টাকার কমের মামলার শুনানী হয়ে থাকে।

আর সিভিল জজ আদালতে ৫ হাজার টাকার অধিক মামলার শুনানী হয়।

জেলা জজের আদালতে ১0 হাজার টাকার কমের মামলায় সব-জজ, মুন্সেফ ও সিভিল জজের রায়ের বিরুদ্ধে শুনানী হয়।

এই আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নাবালকের দেখাশুনার মামলার শুনানী হয়ে থাকে।

১0 হাজার টাকার অধিক টাকার মামলার আপীলের শুনানী উচ্চ আদালতে বা হাইকোর্টে হয়।

রাজস্ব আদালত

এই আদালতে জমির রাজস্ব, খেতমজুর, খেতে মালিকানা ইত্যাদি মামলার শুনানী ও রায় দান হয়ে থাকে।

তহশীলদার ও নায়েব তহশীলদারের আদালতে রাজস্ব বিষয়ক মামলার শুনানী হয়।

জমি একীকরণ মামলার কনসলিডেশন অফিসার, সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার, ডেপুটি ডাইরেক্‌টর, ও ডাইরেক্‌টর কনসলিডেশন অফিসারের আদালতে শুনানী হয়।

সহকারী কালেক্‌টর জমির মালিকানার মামলার রায় দেন।

কমিশনারের আদালতে কালেক্‌টারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী হয়ে থাকে। রাজস্ব বোর্ডের আদালতে কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী হয়।
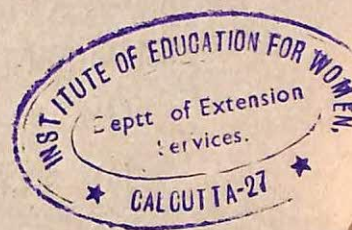
মৌলিক অধিকার

ভারতের অধিবাসীরা যাতে সম্মান ও সুখে জীবন-যাপন করতে পারেন, সেজন্য ভারতের সংবিধান কতকগুলি মৌলিক অধিকার দান করেছে।

যদি কেউ এই অধিকারলাভে বাধা দেন, তার বিরোধিতা করে উচ্চ আদালত বা সর্বোচ্চ আদালতে নালিশ করা যায়।

মৌলিক অধিকার সাত প্রকারের ঃ—

(১) সাম্যের অধিকার।

(২) স্বাধীনতার অধিকার।

(৩) বেগার খাটান ও মানুষ কেনাবেচার বিরোধিতা করার অধিকার।

(৪) যে কোন ধর্ম অনুসরণ করবার অধিকার।

(৫) সম্পত্তির অধিকার।

(৬) নিজ সংস্কৃতি অনুসারে জীবন-যাপন ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।

(৭) এই অধিকারগুলি হননকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে নালিশ করার অধিকার।

দেশের উপর কোন বিপদ এলে সরকার এইসব অধিকারগুলির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

সাম্যের অধিকার

এই অধিকারের নানারকম অর্থ হয়। যেমন,

(১) আইন সবার সাথে সমানভাবে থাকার সুযোগ প্রদান করবে। কিন্তু বিশেষ কারনে এই সুযোগদানে পার্থক্য করা হয়। যেমন,

(ক) সাবালক ও নাবালকদের জন্য আলাদা আইন করা হয়।

(খ) বিভিন্ন জায়গার সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি অনুসারেও ঐ জায়গার জন্য পৃথক আইন তৈরী করতে হয়। যেমন, জমির রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য-বিধানসভা নিজ রাজ্যের সমস্যা অনুসারে উপযোগী আইন তৈরী করে।

(গ) সরকারের অধিকার আছে, নিজ রাজ্যের দরকার মত কোন কোন জিনিষের উপর কর বসাতে নাও পারেন এবং জিনিষ বিশেষে করের তফাৎ হতে পারে।
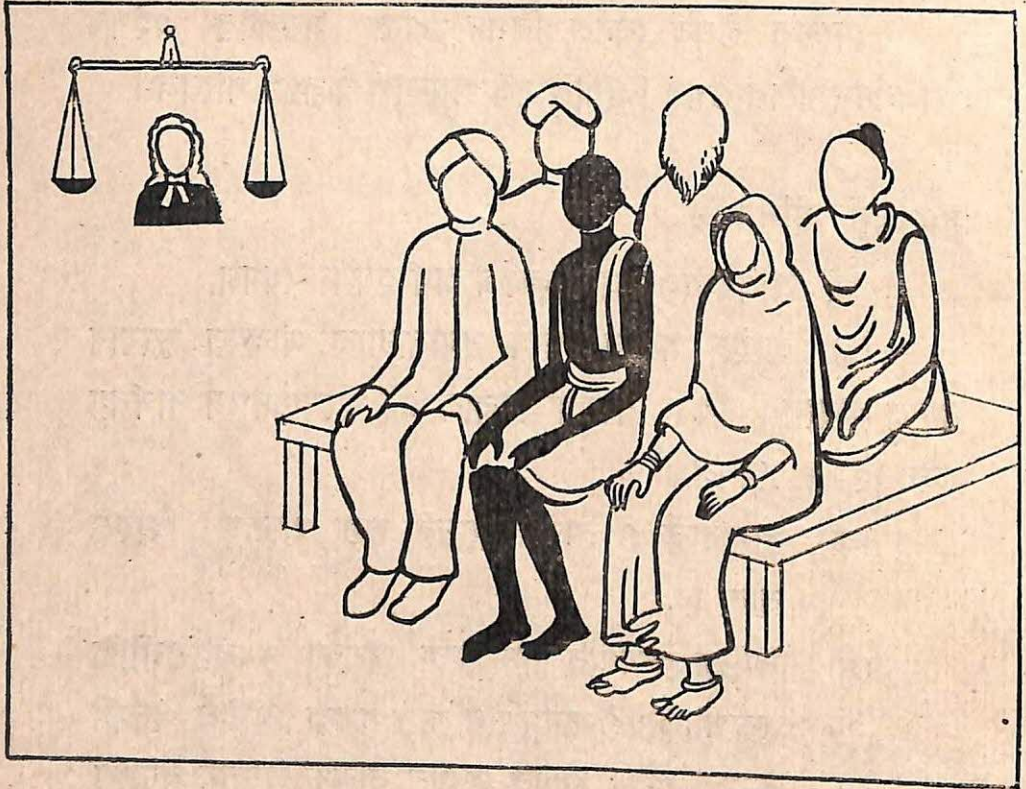
(ঘ) যাতে সরকারী কর্মচারীকে অযথা কেউ হয়রাণ না করে, ও সে নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজ করতে পারে সেজন্য তাকে কিছু বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন, কোন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করার আগে সরকারের আদেশ নিতে হবে।

এই তফাৎ করার অর্থ এই নয় যে আইনের চোখে কাউকে বিশেষ পক্ষপাত করা হচ্ছে।

(২) জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ কোন তফাৎ না করে যে কোন নাগরিককে যদি হোটেল, স্কুল, রাস্তা, কূয়া বা জলাশয় ব্যবহারে কেউ বাধা দেয় তবে সে কাজ বে-আইনী বলে ধরা হবে। তবে স্ত্রীলোক, হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য দরকার হলে বিশেষ আইন সরকার তৈরী করতে পারেন।

(৩) জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান, বাসস্থান কোন তফাৎ না করে প্রত্যেক নাগরিককে চাকুরী পাবার সমান সুযোগ দিতে হবে। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সরকার চাকুরীতে বিশেষ সুবিধা দিতে পারেন, যেমন, চাকুরীতে এদের জন্য কিছু আসন আলাদা করে রাখা। ধর্মস্থানে সেই ধর্মের লোকেরাই থাকতে পারেন, যেমন মন্দিরে হিন্দু ও মস্‌জিদে মুসলমান সম্প্রদায়।

(৪) সরকার বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিদের, যেমন ভারতরত্ন ও পদ্মভূষণ এবং বিশেষ সৈনিক যোগ্যতার জন্য

পরমবীর চক্র ইত্যাদি পদকগুলি ছাড়া আর অন্যকোন প্রকার পদক দেবেন না। কোন নাগরিক অথবা বিদেশী যিনি ভারত সরকারের চাকুরে, রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া বিদেশী পুরস্কার বা পদক গ্রহণ করতে পারবেন না।

স্বাধীনতার অধিকার ঃ

নাগরিক স্বাধীনতা সাত রকমের। কথাবলার স্বাধীনতা ছাড়াও ভারতীয় নাগরিকেরা আরও ছয় রকমের স্বাধীনতা ভোগ করেন। যেমন,

১। কথা বলার স্বাধীনতা
২। সভা করা ও মিছিল বার করার স্বাধীনতা
৩। সংগঠনের স্বাধীনতা
৪। চলাফেরার স্বাধীনতা
৫। বসবাসের স্বাধীনতা
৬। সম্পত্তি রাখার স্বাধীনতা
৭। ব্যাবসা ও চাকুরীর স্বাধীনতা
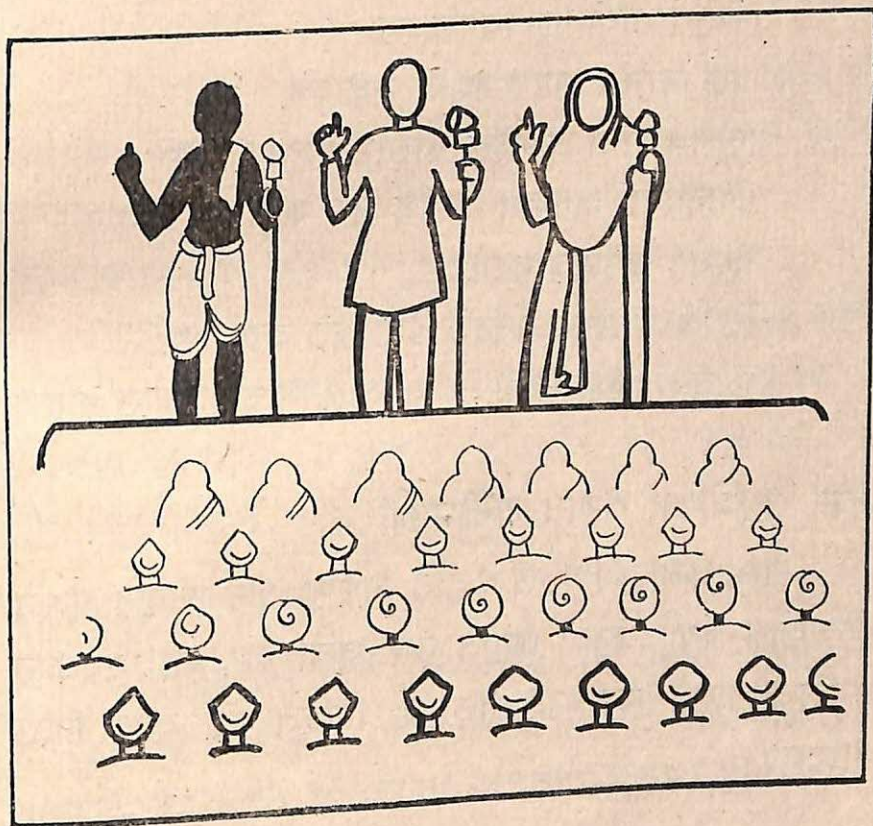
কথা বলার স্বাধীনতা ঃ

এর অর্থ—কথা বলে, লিখে ও ছবির সাহায্যে নিজ মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবারই আছে। কিন্তু এই প্রকাশেও দরকার হলে বাধা দেওয়া হয়। যেমন কারও মত প্রকাশে যদি—

দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়,
অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়,
দেশের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে,
লোকদের আচরণ খারাপ হয়ে যায়,
কারও অপমান করা হয়,
কোন অপরাধ করতে উত্তেজিত করা হয়,
তবে সেক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

সভা ও মিছিল করার স্বাধীনতা

সভা করা ও মিছিল করার উদ্দেশ্য যদি অন্যের উপর অত্যাচার করা অথবা আইন ভঙ্গ করা হয়, তো সরকার শান্তি স্থাপনের জন্য সেই সভা বা মিছিল বন্ধ করে দিতে পারেন।

সংগঠনের স্বাধীনতা

রাজনৈতিকদল, শ্রমিক সংঘ বা অন্য যে কোন দল গঠনের দ্বারা যদি অশান্তি হয় অথবা অন্য লোকেদের আচরণের উপর কোন খারাপ প্রভাব পরে, তাহলে সরকার তা বন্ধ করে দিতে পারেন।

চলাফেরার স্বাধীনতা

ভারতীয় নাগরিক ভারতের যে কোন জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন। কিন্তু যদি দেশের কোন অংশে যাতায়াতে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে সরকার সেখানে যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারেন।

আদিবাসীদের সরল সাধাসিধে সমাজ-জীবনের মাঝে অন্যরা এলে কুপ্রভাব পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় ভারত সরকার আসামের কয়েকটা আদিবাসী এলাকায় অন্যদের যাতায়াত নিষেধ করে দিয়েছেন।

বসবাসের স্বাধীনতা

ভারতীয় নাগরিক ভারতের যে কোন জায়গায় বসবাস করতে পারেন। তবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

সম্পত্তি রাখার অধিকার

প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সম্পত্তি পাওয়ার, রাখবার ও বিক্রয় করার অধিকার আছে। তবে দেশের স্বার্থে সরকার এ বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে

পারেন। যেমন,

মাদকদ্রব্য রাখবার ও বিক্রয়ের উপর
বিষাক্ত ওষুধ যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর
তেল বা গ্যাস যা ক্ষতিকর

যে সব জিনিষ লাইসেন্স ছাড়া বিক্রয় নিষেধ তা লাইসেন্স বিনা রাখলে বা বিক্রি করলে সরকার বাধা দিতে পারেন।

ব্যবসা ও চাকরীর স্বাধীনতা ঃ

জনসাধারণের উন্নতির জন্য সরকার এর এক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন। যেমন—

(১) খারাপ ও ভয়ানক জিনিষের ব্যাবসা এবং বেশ্যাবৃত্তির উপর সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

(২) দেশের বিপদকালে জনসাধারণের জীবন-যাপনের জন্য খুব দরকারী জিনিষের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর সরকার দখল দিতে পারেন। যেমন খাবার জিনিষ, কাপড়, কেরাসিন তেল ইত্যাদি। এ সবের লাভ যাতে ঠিক মত হয় এবং উপযুক্ত দামে জনসাধারণ পায় সরকার

সেজন্য ঐসব জিনিষের দাম বেঁধে দিতে পারেন। সরকার ইচ্ছা করলে প্রয়োজনমত ব্যবসা করতে পারেন।

এছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার আছে এবং বে-আইনীভাবে কেউ কাউকেও অতিষ্ঠ করতে বা গ্রেফতার করতে পারেন না। তবে সরকার যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তির কাজের দ্বারা দেশের অশান্তি হতে পারে, তবে তাকে তিন মাস পর্য্যন্ত গ্রেফতার করে রাখতে পারেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের পরামর্শ মত এই আটকের মেয়াদ আরও বাড়ানো যেতে পারে।

লোকসভা বিচারপতিদের পরামর্শ ছাড়াও এই কয়েদের মেয়াদ ঠিক করতে পারেন।

একই অপরাধে কাউকে দুবার শাস্তি দেওয়া নিষেধ এবং কাউকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য বাধ্য করা যায় না।

কেবলমাত্র অপরাধীর অপরাধের সময়েই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়।

বেগারী ও মানুষ কেনাবেচার বিরোধিতা করার অধিকার

যদি কোন লোককে বেগার খাটান হয়, মানুষ কেনাবেচা কোথাও হয়, বা স্ত্রীলোকের ব্যবসা করান হয় তবে তার বিরোধিতা করা যেতে পারে। কিন্তু দরকার হলে দেশ ও দশের স্বার্থে সরকার বেগার আবশ্যকরূপে করাতে পারেন। যেমন দেশরক্ষার ব্যাপারে সরকার নাগরিকদের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া আবশ্যকীয় করাতে পারেন। এছাড়া চৌদ্দ বছর বয়সের কম বালকদের কোন খনি বা কল-কারখানায় অথবা বিপজ্জনক কাজ করান যায় না।

যে কোন ধর্ম অনুসরণ করার অধিকার

ভারতের নাগরিকের যে কোন ধর্মপালন ও প্রচারের অধিকার আছে। তবে যদি এর দ্বারা দেশের শান্তির ব্যাঘাত হয় অথবা লোকেদের উপর এর কুপ্রভাব পড়ে, তবে সরকার তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

সরকার সমাজ সংস্কারের জন্য কোন ধর্মের আচার-আচরণের সংস্কার করতে পারেন। যেমন, স্বামী বা স্ত্রী

বর্তমানে আবার বিয়ে করায় বাধা দেওয়া যায়। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের জন্য সকল হিন্দুমন্দির খুলে রাখতে অনুরোধ করতে পারেন। সকলেই নিজ নিজ ধর্মীয় স্থান তৈরী করতে পারেন তবে কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতির জন্য কারুর উপর জোর করে কর আদায় করা যায় না। কোন সরকারী বিদ্যালয়ে জোর করে কোন ধর্মীয় বিষয় পড়ান যায় না।

নিজ সংস্কৃতি অনুসারে জীবন-যাপন ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকার ঃ

প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। যেমন বিদ্যালয় গড়তে পারেন। কিন্তু
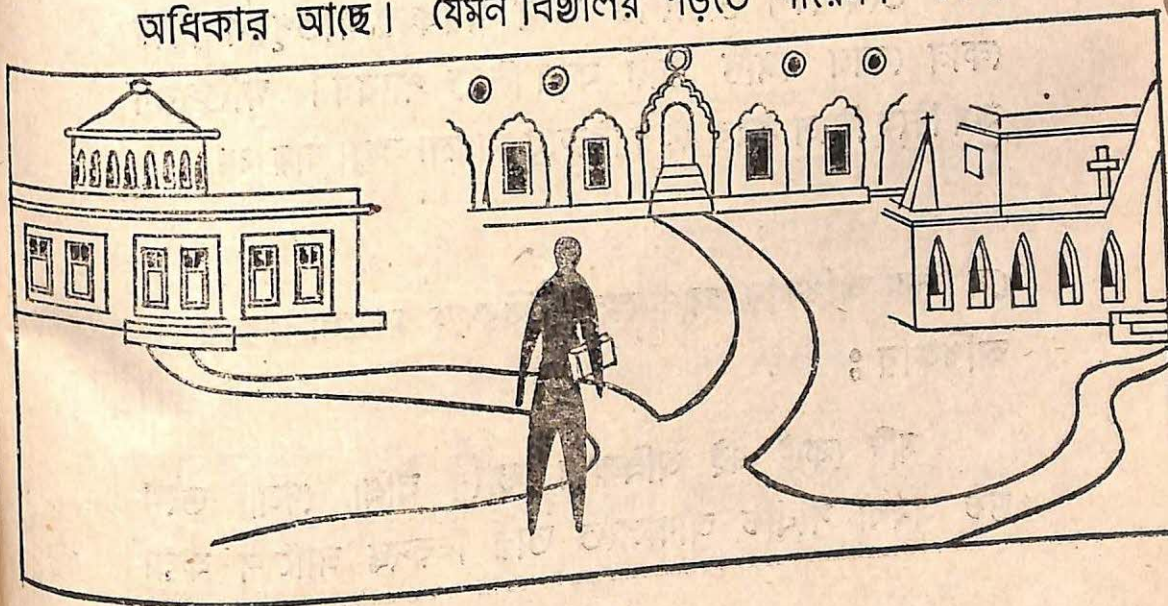
ওই বিদ্যালয়ে নিজ ধর্ম, জাতি, ভাষার জন্য তাকে পড়তে বাধা দেওয়া যায় না।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা নিজ ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বিদ্যালয় গড়তে পারেন এবং সরকার এই সব বিদ্যালয়ের সহায়তা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করবেন না।

সম্পত্তির অধিকার

কারও সম্পত্তি জোর করে দখল করা যায় না।

তবে দেশ ও দশের স্বার্থে সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোন কোন সম্পত্তি জোর করে নিতে পারেন। ক্ষতিপূরণ কম দিয়ে নিলে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না।

মৌলিক অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ঃ

যদি কেউ এই অধিকার ভোগে বাধা দেন, তবে উচ্চ অথবা সর্বোচ্চ আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা

যায়। যেমন, যদি অকারণে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে ও ২৪ ঘণ্টার ভেতর তাকে কোন আদালতে হাজির
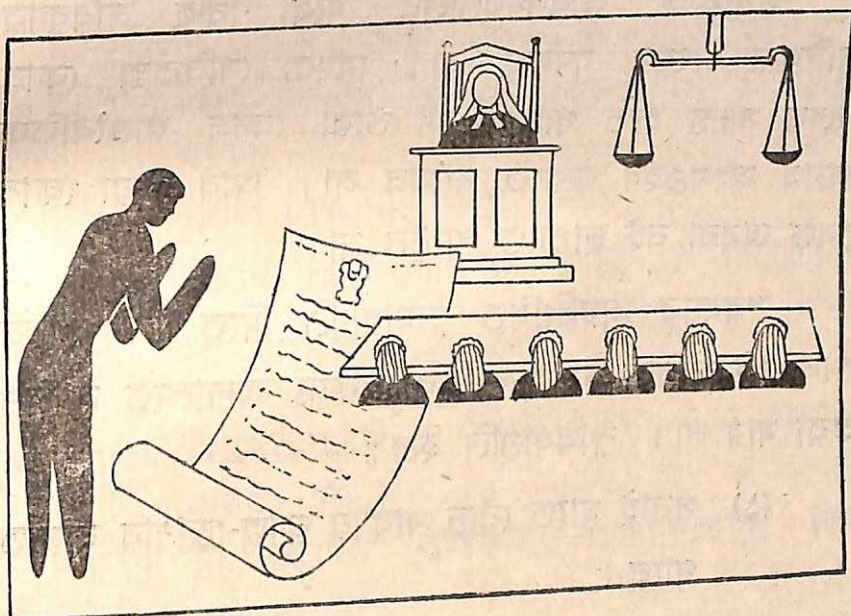
না করায় তাহলে এই বেআইনী আটকের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারকারীকে দোষী সব্যস্ত করতে পারেন। দেশের সংকটকালে রাষ্ট্রপতি যখন এই অধিকারগুলির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন তখন এর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা যায় না।

যেসব অধিকার নাগরিকগণ পেয়েছেন তাছাড়া অন্য

অধিকারগুলি হরণের বিরুদ্ধে অনাগরিকরা নালিশ করতে পারেন।

উপরোক্ত অধিকারগুলির মধ্যে কিছু অধিকার সৈনিকরা ভোগ করেন না। যেমন, সৈনিকরা কোন দলের সদস্য হতে পারেন না, তাঁরা কোন রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আর তাঁরা কোন প্রবন্ধ অথবা বই ছাপাতে পারেন না।

সরকার নিম্নলিখিত সুযোগগুলি দিতে চেষ্টা করেন তবে এই সুবিধা না পেলে এর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা যায় না। সুবিধাগুলি হল:

(১) সবাই যাতে বেঁচে থাকার রুজি-রোজগার করতে পারে।

(২) সবাই যেন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে।

(৩) একই প্রকারের কর্মচারীদের একই রকমের যেন বেতন হয়।

(৪) কাউকেও এমন কোন কাজের জন্য যেন বাধ্য না করা হয়, যাতে তার শরীরের কোন ক্ষতি

হতে পারে, অথবা যে কাজ তার পক্ষে অসাধ্য হবে।

(৫) গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত তৈরী করতে হবে।

(৬) সবাইকে কাজের ও পড়ার সুযোগ দিতে হবে। আর বেকার, বৃদ্ধ ও অসুস্থকে সাহায্য করতে হবে।

(৭) কুটির শিল্প চালু করতে হবে।

(৮) ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক ও বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) অনুন্নত জাতি ও বর্ণের বিশেষভাবে দেখাশুনা করতে হবে।

(১০) নাগরিকদের বাসস্থান স্বাস্থ্যপ্রদভাবে তৈরী করতে হবে।

(১১) কৃষি ও পশুদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। দুগ্ধবতী পশু এবং মালবাহী পশুর হত্যা করা নিষেধ।

(১২) সুন্দর ও ঐতিহাসিক ভবনগুলির রক্ষা করা দরকার।

(১৩) সরকারের উচিত সর্বদা অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব রেখে চলা।

নাগরিকতা

যাঁরা দেশের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকেন, তাঁদেরই নাগরিক বলা হয়। বিদেশীরা সবরকম সুবিধা লাভ করতে পারেন না।

একমাত্র নাগরিকেরাই মৌলিক অধিকার লাভ করেন এবং এরই ফলে তাঁরা সর্বপ্রকার সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

দেশের যে কোন নাগরিকই বড়বড় পদ যেমন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিচারপতি, মন্ত্রী, সংসদ ও বিধান-মণ্ডলীর সদস্য হবার যোগ্য। সরকারী কর্মচারীও হতে পারেন।

ভারতীয় নাগরিক কে?

(১) জন্মগতভাবে নাগরিক—যিনি নিজে অথবা তাঁর মা বাবার মধ্যে যে কোন একজন ভারতে জন্মগ্রহণ

করেছেন অথবা যিনি নিজে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ৫ বছর আগে থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাঁরাই ভারতের নাগরিক।

২। পাকিস্তান থেকে ভারতে আগতদের নাগরিকত্ব লাভ—যিনি ১৯শে জুলাই ১৯৪৮ সালের আগে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন এবং যাঁর মা বাবা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে যে কোন একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং ভারতে আসবার পর থেকে স্থায়ীভাবে যিনি বাস করছেন তাঁকেই নাগরিক বলা যেতে পারে।

৩। যিনি ভারতে আসবার পর একটানা ৬ মাস বাস করার পর নাগরিকতা লাভের জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন।

৪। যাঁর কাছে এরূপ প্রমাণ আছে যে নাগরিকত্ব লাভের দরখাস্ত পেশ করবার ৬ মাস আগে থেকে ভারতে বসবাস করেছেন।

৫। ভারতীয় সরকারের কোন উচ্চপদস্থ অফিসার যাঁকে নাগরিকতা প্রদান করেছেন।

৬। যাঁদের পিতামাতা ভারতে জন্মলাভ করেছেন অথচ ১লা মার্চ্চ ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা নাগরিকতা হারাবেন কিন্তু তাঁরা

যদি আবার ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করেন এবং ১১শে জুলাই ১৯৪৮ সালের পর পাকিস্তান হতে আগমনকারীদের মত শর্ত্ত পূরণ করেন তা'হলে তাঁদের নাগরিক বলা যেতে পারে।

৭। যাঁদের পিতামাতা ভারতে জন্মেছেন কিন্তু নিজে বিদেশে থাকেন, তাঁরা বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে দরখাস্ত দিয়ে নিজ নাম ভারতীয় নাগরিকের তালিকায় লেখার পর ভারতের নাগরিক হবেন।

৮। যাঁরা ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ অথবা তারপর ভারতে জন্মেছেন তাঁরা নাগরিকতা পেতে পারেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে তাঁরা ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করতে পারেন না ঃ যেমন,

(অ) তাঁর পিতা যদি শত্রুর দেশের অধিবাসী হন ;

(আ) তাঁর পিতাকে যদি রাষ্ট্রদূতের উপযোগী সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

৯। যাঁর বাবা ভারতের জন্মগত নাগরিক এরূপ লোকের জন্ম যদি ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে অথবা পরে হয়ে থাকে তবে তিনিও ভারতের নাগরিক হবেন।

১০। যে স্ত্রীলোকের বিবাহ কোন ভারতীয় নাগরিকের সাথে হয়েছে, তিনিও ভারতের নাগরিক হবেন।

১১। বিদেশী নাগরিকরা দরখাস্ত করে ভারতের নাগরিক হতে পারেন, যদি তিনি নিম্নলিখিত শর্তগুলি স্বেচ্ছায় পূরণ করেন ঃ

(অ) তিনি পূর্বে কোন ভারত বিরোধীদেশের নাগরিক ছিলেন না।

(আ) তিনি স্বয়ং নিজদেশের নাগরিকতা ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

(ই) নাগরিকতা লাভের আবেদন পেশ করবার আগে এক বছর একটানা ভারতের মাটিতে বসবাস করে এসেছেন। অথবা ভারতে সরকারী চাকুরী করেছেন।

(ঈ) যাঁর আচরণ আপত্তিজনক নয়।

(উ) তিনি ঐ এক বছরের আগে ৭ বছরের মধ্যে কম করে ৪ বছর পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন বা ভারত সরকারের অধীনে কোন চাকুরী করেছেন।

(ঊ) তিনি কমপক্ষে ভারতের যে কোন একটি ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে জানেন।

(এ) তিনি নাগরিকতা লাভের পর ভারতে বসবাস অথবা ভারত সরকারের যে কোন প্রকার চাকুরী গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

১২। ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, রোডেশিয়া, আয়ারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের সাবালক লোকেরা উপরের নিয়মগুলির আওতায় না এসে যদি কেবল মাত্র ভারতের নাগরিক হবার জন্য আবেদন করেন তবে তিনিও ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন।

১৩। যদি ভারত কোন নূতন জায়গার মালিকানা লাভ করে তবে সেখানকার অধিবাসীরাও ভারতের নাগরিক হতে পারেন।

ভারতে নাগরিকতা ত্যাগের উপায়

যদি কোন ভারতীয় নাগরিক, স্বেচ্ছায় অন্যদেশের নাগরিক হন তবে তিনি দরখাস্ত দিয়ে ভারতের নাগরিকতা ছেড়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ঐ ভারতীয় যদি পুরুষ হন তবে তাঁর নাবালক সন্তানও ভারতের নাগরিকতা হারাবে। কিন্তু তাঁর সন্তানরা যদি সাবালক হওয়ার এক বছরের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকতা লাভের জন্য দরখাস্ত দেন তবে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় নাগরিকতা বিলুপ্ত হওয়ার উপায়

(১) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক তাঁর কথাবার্ত্তা অথবা কাজের দ্বারা প্রমাণ করেন যে তিনি ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত, তা হ'লে তিনি ভারতীয় নাগরিকতা হারাবেন।

(২) যুদ্ধের সময় যদি কেউ বিরোধী দেশকে সহায়তা করেন অথবা বিরোধী দেশের সাথে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য করেন বলেন তবে তিনিও ভারতের নাগরিকতা হারাবেন।

(৩) যদি কোন ভারতীয় মহিলা কোন বিদেশী নাগরিককে বিয়ে করে বিদেশেই বসবাস করেন তবে তিনি ভারতের নাগরিকতা হারাবেন।

(৪) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিক হয়ে থাকেন তবে তাঁর ভারতীয় নাগরিকতা শেষ হয়ে যাবে।

চাকুরী

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে আর রাজ্য-সরকারের কর্মচারী রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে চাকুরী করে থাকেন। কেবল নীচে বর্ণিত লোকদের বেলায় এই কথা খাটে না :

জজ, পাবলিক সারভিস্ কমিশনের অধ্যক্ষ আর সদস্য।

এমনও হতে পারে যে খুব গুণী কোন লোককে যখন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কোন পদে নিয়োগ করেন তখন তাঁর কাজ শেষ হলে বা তিনি অবসর গ্রহণ করলে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি আগেই দেওয়া হয়। তবে সব রকমের চাকুরীতে এই প্রতিশ্রুতি থাকে না।

সামরিক চাকুরী ছাড়া আর সকল সরকারী চাকুরীতে নিচে লেখা কয়েকটি অধিকার দেওয়া থাকে :

১। যে অফিসার চাকুরী দেন তাঁর নীচের পদের কোন অফিসার সেই চাকুরী খতম করতে পারেন না।

২। যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অবাধ্যতা বা বদচলনের অভিযোগ এনে তাঁকে তাঁর পদের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি সেই অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। কিন্তু যাঁরা চাকুরীতে অবসর নিচ্ছেন তাঁদের বেলা এ কথা খাটে না।

যদি চাকুরীর কায়দা-কানুনে লেখা থাকে যে এত দিনের নোটিশ্‌ দিয়ে তাঁর চাকুরী খতম করা হবে, তাহলে যাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁর বেলাও উপরে লেখা সুবিধাগুলি খাটবে না।

চাকুরীতে নিয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি লোক-সেবা নিয়োগ কমিশন বা পাবলিক সারভিস্‌ কমিশনের ব্যবস্থা আছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের সকল চাকুরীতে লোক নিয়োগ করে। এর সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্যেও আলাদা আলাদা লোক-সেবা নিয়োগ কমিশন আছে যাঁরা রাজ্য সরকারের চাকুরীতে লোক নিয়োগ করেন।

পাবলিক সারভিস কমিশন বা লোক-সেবা নিয়োগ কমিশন :

যেসব চাকুরী খালি হয় তার জন্য লোক-সেবা কমিশন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। তাঁরা চাকুরীর

দরখাস্তগুলি বিচার করেন, আবেদন-কারীদের পরীক্ষা নেন এবং ইণ্টারভিউ নেন, আর ইণ্টারভিউতে পাশ করা লোকেদের চাকুরী দেন। লোক-সেবা কমিশনের মারফৎ বেশির ভাগ সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরী বণ্টনের জন্য গঠিত লোক-সেবা কমিশনের অধ্যক্ষ আর সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। রাজ্যপালেরা আপন আপন রাজ্যে লোক-সেবা কমিশনের অধ্যক্ষ আর সদস্যদের নির্বাচন করেন। যদি এই অধ্যক্ষ আর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সুপ্রিম্ কোর্টের সমর্থন পায় তাহলে এঁদের পদ থেকে হটানো যেতে পারে। লোক-সেবা কমিশনের সদস্যরা তাঁদের অবসর নেবার বয়স পর্যন্ত থাকতে পারেন বা যে তারিখে চাকুরীতে বহাল হয়েছেন সেই তারিথ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত (যেটি আগে পড়ে) আপন পদে থাকতে পারেন।

নির্বাচন

সংসদ আর বিধান-মণ্ডলের সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি আর উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন দেখা-শোনা করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে এক বা একাধিক নির্বাচন কমিশনার থাকেন। লোক-সভা আর বিধান-সভার নির্বাচনে (যাকে সাধারণ নির্বাচন বলা হয়) ভোটদাতাদের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। এই তালিকায় ২১ বছর বয়সের ওপর সকল স্ত্রী-পুরুষের নাম, ঠিকানা, কোন জাতি বা ধর্ম বিচার না করে লেখা হয়ে থাকে। যাঁর নাম এই তালিকায় থাকে না, তিনি ভোট দিতে পারেন না। এই সকল লোকদের নাম তালিকায় থাকে না :—

১। পাগল লোকেরা।

২। যাঁরা ভোটের জায়গায় বসবাস করেন না।

৩। যিনি নির্বাচনের সংগে সম্পর্কিত কোন অন্যায় কাজ করেছেন।

নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যায় কাজ হল এইগুলি ঃ—

কোনো লোককে ভোটদানে বাধা দেওয়া, ভোটদাতাদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করা, অপরকে নির্বাচনে দাঁড়াতে না দেওয়া, অন্যের নামে মিথ্যা বা জাল ভোট দেওয়া, ভোটের কাগজ নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি।

নির্বাচন সংক্রান্ত কোন মামলা কোন সাধারণ আদালতে করা যায় না। এই ধরনের মামলার নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচনী আদালত গঠন করা হয়।

রাজ-কার্যের ভাষা

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ-কাজের ভাষা হিন্দী (দেবনাগরী লিপি) কিন্তু সংবিধান তৈরীর পর ১৫ বছর অবধি সমস্ত সরকারী কাজকর্ম ইংরেজি ভাষায় করা হবে এইমত স্থির করা ছিল। রাষ্ট্রপতি এর আগেও হিন্দী ভাষাকে চালুকরার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু ১৫ বছর কেটে গেল, এখনও এ সম্বন্ধে কোন কিছু স্থির করা হয়নি।

কোনো রাজ্যের বিধান মণ্ডল আপন রাজ্যে যে ভাষায় কথা বলা হয়ে থাকে তার মধ্যে এক বা একাধিক ভাষাকে অথবা হিন্দীকে সরকারী কাজের জন্যে ব্যবহার করার আইন তৈরী করতে পারেন। যতদিন সে আইন না তৈরী করা সম্ভব হয় ততদিন ইংরেজি ভাষাই চালু থাকবে। যদি কোনো রাজ্যের বেশির ভাগ অধিবাসী চায় যে তাদের ভাষাই সরকারী ভাষা হোক তা হলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি মিললে পর সেই ভাষাই পুরো রাজ্যের বা তার কোন অংশের সরকারী ভাষা হবে।

সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্টের কাজকর্ম ইংরেজি ভাষাতেই হবে। রাজ্যপাল আপন রাজ্যের হাইকোর্টের

ভাষা (রাষ্ট্রপতি অনুমতি নিয়ে) হিন্দী করতে পারেন কিন্তু বিচারের রায়ের ভাষা সর্বদা ইংরেজিতেই থাকবে।

সকল লোকের এই অধিকার আছে যে তাঁরা তাঁদের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অফিসারের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষায় আর রাজ্য-সরকারের অফিসারের সামনে রাজ্য-সরকারের সরকারী ভাষায় পেশ করতে পারবেন। প্রত্যেক রাজ্যসরকার চেষ্টা করবেন, যে-ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যা কম তাঁদের লেখাপড়া আরম্ভ তাঁদের আপন ভাষাতেই করা হবে। এইসব সংখ্যালঘু লোকেদের দেখা-শোনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন অফিসার নিযুক্ত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান সংখ্যালঘুদের যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তারা কতখানি উপকৃত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করবেন হিন্দী ভাষার যাতে প্রচার হয়, তার উন্নতি হয় আর তাতে ভারতের অন্যান্য ভাষার শব্দ যোগ করে তাকে আরও কাজের ও ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়।

ভারতে যে সব ভাষাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত হয় তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল ঃ—

আসামী, বাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, কানাড়ি, কাশমিরী, মলয়ালী, মারাঠি, ওড়িয়া, পানজাবি, তামিল, তেলেগু, আর উর্দু।

কিছু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা

বিধান-সভা আর লোক-সভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের ও জাতিদের জন্য কিছু স্থান সংরক্ষিত করা আছে। লোক-সভায় আসামের অনুন্নত জাতিদের জন্য স্থান সংরক্ষিত করা আছে। লোক-সভার জন্য রাষ্ট্রপতি আর বিধান-সভার জন্য রাজ্যপাল এংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যদের নাম মনোনীত করেন। চাকুরী দেবার বেলাতেও অনুন্নত জাতিগুলির লোকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

পিছিয়ে থাকা আর অনুন্নত জাতিদের কল্যাণ আর তাদের দেখা শোনার জন্য সরকার একজন অফিসার নিয়োগ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে এইসকল জাতির উন্নতি আর অবস্থা ভাল করার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। শিক্ষায় এবং সমাজের চোখে পিছিয়ে পড়া জাতিদের স্থান এবং তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ করার জন্যে রাষ্ট্রপতি কিছু লোকদের নিযুক্ত করতে পারেন। এঁরা এদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাঁকে পরামর্শ দেন।

এইসকল জাতি এই বিশেষ সুবিধাগুলি ১৯৭০ সাল অবধি ভোগ করবেন। কিন্তু এই সুবিধা জম্মু আর কাশমির রাজ্যের জন্য দেওয়া হয়নি।

রাজ-কার্য আর অর্থ

কেন্দ্রীয় সরকার অন্য দেশ থেকে টাকা ধার নিতে পারেন, কিন্তু রাজ্য-সরকার কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেই টাকা ধার নিতে পারেন। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসিয়ে রাজকাজে টাকার প্রয়োজন মেটানো যায়। কিছু ট্যাক্স কেবল কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে থাকেন, যেমন আয়কর। রাজ্যসরকার যেসব বিষয়ে আইন বানাতে পারেন, সেই সব বিষয়েই কিছু ট্যাক্স আদায় করতে পারেন। যেমন জমি, সেল্স ট্যাকস্, বাড়ী জন্তু-জানোয়ারের ওপর ট্যাকস্। কিছু ট্যাকস্ কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভাগ করে নেন। যেমন, যাত্রী ট্যাকস্, রেলের ভাড়ার ওপর ট্যাকস্ ইত্যাদি।